"পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে"

রামায়ণ

[তৃতীয় সংস্করণ]

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি, এ

সম্পাদিত

শিশির পাবলিশিং হাউস

২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি-এ কর্ত্তৃক কলিকাতা, ২২।১ নং, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ
শিশির পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্ত্তৃক উক্ত
স্থানে অবস্থিত শিশির প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত।

মূল্য দুই টাকা মাত্র

নিবেদন

ভারতবাসীর নিকট রামায়ণের পরিচয় নূতন করিয়া দেওয়া ধৃষ্টতামাত্র। যে রামায়ণের নিকট রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা চিরঋণী, গিরিশচন্দ্রের অমর-লেখনী কৃতজ্ঞতার ভারে অবনত, মাইকেলের কাব্য-যশলক্ষ্মী অক্ষয় প্রাণ লাভ করিয়াছে, সেই রামায়ণের কাহিনী সুমধুর ভাষায়, সাবলীল ভঙ্গিমায় বহু চিত্র-সম্পদে শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

রামায়ণের এই সংস্করণের কয়েকটি বিশেষত্ব রহিয়াছে। রামায়ণে উল্লিখিত প্রধান চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ এই পুস্তকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এই বৈশিষ্ট্য অন্য কোন বালপাঠ্য রামায়ণে নাই।

রামায়ণের প্রভাব, রামায়ণী সাহিত্য, রামায়ণের নীতি ও আদর্শ প্রভৃতি এমন অনেক বিষয় এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যাহা এই ধরণের অন্য কোন পুস্তকে অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই।



বিষয়-সূচী

রামায়ণ

আদিকাণ্ড

রামায়ণের জন্মকথা

অনেক দিন আগেকার কথা। হিন্দুশাস্ত্রে যাহাকে ত্রেতাযুগ বলে, সেটা যে ঠিক বর্ত্তমান কাল হইতে কত বৎসর আগে তাহা এখনও সঠিক নির্ণয় করা যায় নাই, তবে সেটা যে বহুদিন, এমন কি কয়েক হাজার বৎসর আগেকার কথা, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। খৃষ্ট জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও, এখন যে দেশ পৃথিবীর মধ্যে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতার অগ্রগণ্য, সেই ইউরোপও যখন গুহাবাসী, বল্কলধারী, বর্ব্বর মানুষে পূর্ণ ছিল, তখন ভারতবাসীরা যে জ্ঞানে ও সভ্যতায় বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল, একথা এদেশী এবং বিদেশী বহু ঐতিহাসিক সপ্রমাণ করিয়াছেন। যখন সারা বিশ্বের লোক সভ্যতা এবং জ্ঞানে অগ্রগণ্য ভারতবর্ষে অবনত মস্তকে, সশ্রদ্ধচিত্তে বিদ্যাশিক্ষার জন্য আসিত, আমরা সেই ভারতের [illegible] অতীত যুগেরই একটি কাহিনী আজ বলিব।

ভারতবর্ষ তখন সত্যই সোনার দেশ ছিল। তখন মানুষ ছিল কম, মানুষের বিলাসিতার প্রবৃত্তি ছিল আরও কম, অথচ জমি ছিল সুজলা, সুফলা, স্বর্ণপ্রসূ। বিনা আয়াসে মানুষ তখন প্রয়োজনের অপেক্ষা বেশী জিনিষ পাইত।

তখন রাজারা বিধিসম্মত ভাবে রাজ্যপালন করিতেন এবং প্রজাদের কল্যাণ-চিন্তা ও তাহাদের রক্ষা করাকে নিজেদের একমাত্র কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। আর ব্রাহ্মণেরা জনপদ হইতে দূরে, ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বর হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া স্বীয় দেশ তথা বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য একান্ত মনে বিদ্যাচর্চ্চা ও ঈশ্বর-আরাধনা করিতেন। সামান্য কুটীরে বাস ও বল্কল পরিধান করিয়াও তাঁহারা ছিলেন দেশের সকলের পূজ্য, রাজ্যবিধির নিয়ন্তা। স্বয়ং রাজারাও নিজেদের হৈমমুকুট ঐ সকল দীন অথচ পরকল্যাণকামী সাধুদের পদধূলিতে রাখিতে ইতস্ততঃ করিতেন না, কারণ ঐ সকল নির্লোভ ব্রাহ্মণেরা নিজেদের সমস্ত ঐহিক সুখ তুচ্ছ করিয়া জ্ঞানচর্চ্চা ও বিশ্বের কল্যাণচিন্তায় নিজেদের উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

এই সকল ব্রাহ্মণদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন গৃহী, তাঁহারা জনপদে থাকিয়া যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রভৃতি ব্রাহ্মণের ছয়টি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া অন্যান্য জাতিকে জীবনযাত্রায় সহায়তা করিতেন। আর কেহ কেহ জনপদের বাহিরে গভীর অরণ্যে কিম্বা পর্ব্বতের উপত্যকায় কুটীর বাঁধিয়া কঠোর তপস্যায় রত থাকিতেন। ইহাদের বলা হইত ঋষি বা চলতি কথায় মুনি। এই সব মুনিদের আশ্রমকে বলা হইত তপোবন।

তপোবনগুলি অতি পবিত্র ও সুন্দর স্থান ছিল। ছোট ছোট কুটীরে ঐসব ঋষিদের শিষ্যরা কিম্বা নবীন বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারীরা বাস করিতেন, সকাল-সন্ধ্যায় তাঁহাদের কণ্ঠনিঃসৃত বেদগান ঈশ্বরের স্তুতি বহন করিয়া বুঝি বা তাঁহারই পদপ্রান্তে পৌঁছাইয়া দিত। সেখানে হিংসা দ্বেষ কলহ ছিল না, ছিল না বিলাসিতার কোন উপকরণ। হোমের সুগন্ধ, ফুলের সৌরভের সঙ্গে মিলিত কণ্ঠের সামগান মিলিয়া স্থানটিকে নিরন্তর ঈশ্বরের উপযুক্ত মন্দির করিয়া রাখিত।

এই সকল ঋষিদের মধ্যেই একজন—মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহার নাম—রামায়ণ

গ্রন্থটি রচনা করেন। আমাদের শাস্ত্রানুসারে এই মহাকাব্যটিই সংস্কৃত ভাষায় প্রথম 'কাব্য গ্রন্থ'। কিন্তু রামায়ণের কথা বলিবার আগে মহর্ষি বাল্মীকির পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

বহুদিন আগে, রামায়ণ-রচনারও বহু পূর্ব্বে রত্নাকর নামক একজন দুর্দ্দান্ত দস্যু ছিল। জীবিকা-নির্ব্বাহের অপর কোনও চেষ্টা সে কোনও দিনই করে নাই; অরণ্যের আড়ালে, রাত্রির অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া সে বসিয়া থাকিত, নিরীহ পথিককে দেখিলেই তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। এইভাবে কত নির্দ্দোষ, নিরপরাধ লোক যে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। শেষে যখন রত্নাকরের অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন একদা স্বয়ং ব্রহ্মা ও নারদ দুইজনে গৃহস্থ ব্রাহ্মণের বেশে রত্নাকরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

বলা বাহুল্য যে রত্নাকর তখনই তাঁহাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইল। তখন ব্রহ্মা তাহাকে ক্ষণকালের জন্য নিরস্ত হইতে বলিয়া কহিলেন, বাপু হে, তুমি যে নির্ব্বিচারে নরহত্যা করিয়া চলিয়াছ, ইহার পরিণাম কি হইবে ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? এত পাপের শাস্তি তুমি একা ভোগ করিবে কেমন করিয়া?

রত্নাকর উত্তর দিল, ঠাকুর, আমি একা ভোগ করিব কেন? আমি দস্যুবৃত্তি করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করি তাহাতে আমার সংসার চলে। পিতা মাতা, স্ত্রী, পুত্র সকলেই ঐ অর্থের সাহায্যে বাঁচিয়া আছে। সুতরাং পাপ যদি আমার হয়ই—তাহার ফল সকলে মিলিয়া ভোগ করিব।

ব্রহ্মা হাসিয়া বলিলেন, তা হয় না। পিতা-মাতা বৃদ্ধবয়সে যখন অসমর্থ হইয়া পড়েন, তখন তাঁহাদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিতে প্রত্যেক পুত্রই বাধ্য। আর স্ত্রী-পুত্রকেও ভরণপোষণ করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তোমারই। তুমি কি ভাবে সে দায়িত্ব পালন করিতেছ, কি ভাবে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছ

উহা তাহাদের বিবেচনা করিবার কথা নহে। সুতরাং এই যে পাপ তুমি জমা করিতেছ ইহা একমাত্র তোমারই।

রত্নাকর কথাটা বিশ্বাস করিল না, বরং চটিয়া জবাব দিল, তাহা কখনও হয়? এ-পাপের ভাগ তাহাদেরও লইতে হইবে।

ব্রহ্মা কহিলেন, তাহা হয় না। আচ্ছা, তুমি না হয় বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করিয়া এস।

রত্নাকর কহিল, ভারী মজা পাইয়াছ—না? আমি বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করিতে যাই, আর তোমরা ইতিমধ্যে সরিয়া পড়!

ব্রহ্মা আশ্বাস দিয়া কহিলেন, যদি তোমার এতই অবিশ্বাস হয়, তুমি বরং আমাদের এই গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়া যাও। যদি তোমার কথাই সত্য হয়, তাহা হইলে তুমি ফিরিয়া আসিয়া আমাদের হত্যা করিও।

যুক্তিটা রত্নাকরের মনে লাগিল। সে উহাদের একটা গাছের সঙ্গে ভাল করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিয়া গেল।

প্রথমেই সে গেল তাহার পিতার নিকটে। বৃদ্ধ চলচ্ছক্তিরহিত পিতাকে গিয়া সে প্রশ্ন করিল, বাবা, আমি যে দস্যুবৃত্তি করিয়া পয়সা জমাইয়া আপনাদের খাওয়াইতেছি, ইহাতে আমার যা পাপ হইতেছে তাহার অংশ আপনারাও লইবেন ত?

পিতা ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, কখনও না। তুমি যখন ছোট ছিলে, আমি উপার্জ্জন করিয়া তোমাকে মানুষ করিয়াছি, এখন আমি বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি, সুতরাং আমাকে বাঁচাইয়া রাখা ও সেবা করা তোমার কর্ত্তব্য। সে-কর্ত্তব্য তুমি কেমন করিয়া পালন করিতেছ, আমি তাহার কি জানি?

রত্নাকর অত্যন্ত দমিয়া গেল। কিন্তু তবুও সে মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি সেখান হইতে মায়ের কাছে গেল।

তিনিও কিন্তু তাহার পাপের অংশ গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। হতাশ হইয়া সে স্ত্রীর কাছে গেল, সেখানেও সেই একই ফল। তিনি কহিলেন, যখন আমাকে তুমি বিবাহ করিয়াছ, তখন আমার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে তুমি বাধ্য। তুমি কি ভাবে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছ, তাহা আমার দেখিবার কথা নহে।

রত্নাকর তখন রীতিমত ভয় পাইল। তাহার পাপের গুরুত্ব চিন্তা করিয়া সে বিহ্বল চিত্তে ছুটিয়া আসিয়া ব্রহ্মার পায়ে পড়িল; কহিল, আপনি নিশ্চয় ছদ্মবেশী কোন মহাজন। আপনি যখন এতই দয়া করিয়াছেন, তখন আপনি আমার মুক্তির উপায়ও বলিয়া দিন, নচেৎ আমার আর রক্ষা নাই।

ব্রহ্মা তখন তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, তোমার ভয় নাই বাপু, তুমি রাম নাম জপ কর, তোমার সমস্ত পাপ নষ্ট হইবে।

রত্নাকর তখনই রাম-নাম জপ করিতে গেল। কিন্তু যে অতগুলি নরহত্যা করিয়াছে, রামচন্দ্রের পবিত্র নাম তাহার মুখ দিয়া বাহির হইবে কেন? কিছুতেই সে ঐ সামান্য দুটি অক্ষর উচ্চারণ করিতে পারিল না।

আবার সে পিতামহ ব্রহ্মার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল, কি উপায় হইবে আমার দেব? কেমন করিয়া আমি উদ্ধার পাইব?

ব্রহ্মা তখন তাহাকে উপদেশ দিলেন, তুমি 'মরা' 'মরা' বলিতে আরম্ভ কর, তাহা হইলেই সহসা এক সময় তোমার মুখ দিয়া রাম-নাম বাহির হইবে। এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

রত্নাকর আর বাড়ী গেল না, সেইখানেই বসিয়া রাম-নাম জপ করিতে লাগিল। এত একাগ্রচিত্তে সে তপস্যা করিতে লাগিল যে, তাহার আর কোন বাহ্যজ্ঞান রহিল না। ক্রমশঃ পাথর ভ্রমে তাহার চারিপাশে বল্মীক জড় হইয়া তাহাকে চাপা দিয়া দিল।

এই ভাবে দস্যু রত্নাকর হইলেন ঋষি রত্নাকর। বল্মীকের নীচে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নূতন নাম-করণ হইল মহর্ষি বাল্মীকি!

বাল্মীকি ঋষিত্ব লাভের পর একদিন নদীতে স্নান করিতে যাইতেছিলেন। নদীতে নামিবার মুখে তাঁহার চোখে পড়িল, দু'টি পাখী নিভৃতে মুখোমুখি বসিয়া আছে। এক ব্যাধ দূর হইতে তাহাদের দেখিয়া তীর-নিক্ষেপে একটি পাখীকে মারিয়া ফেলিল। একজনের মৃত্যুতে আর একটি পাখী অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। তাহার দুঃখে ব্যথিত হইয়া মহর্ষি বাল্মীকি সহসা সেই ব্যাধকে অভিশাপ দিয়া বসিলেন। কিন্তু অভিশাপ যে দিলেন—সোজাসুজি ভাষায় নহে, কবিতায়!

অভিশাপ দিবার পরই তিনি চমকিয়া উঠিলেন, এ কি অপূর্ব্ব জিনিষ তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল! বড় মধুর ত! সোজা কথাগুলিকে ছন্দ গাঁথিয়া বলিলে এত মিষ্ট শোনায়? তিনি এবং তাঁহার শিষ্যেরা সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া সেই কথাই আলোচনা করিতে লাগিলেন! শোক হইতেই পৃথিবীতে প্রথম কবিতার জন্ম হইল বলিয়া সংস্কৃত ভাষায় উহার নাম করা হইল 'শ্লোক'!

এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারের কয়েকদিন পরেই দেবর্ষি নারদ বাল্মীকির তপোবনে দেখা দিলেন। নারদ লোক-পিতামহ ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং ঋষিদের মধ্যে অগ্রগণ্য। পরস্পর কুশল-বিনিময়ের পর নারদ প্রশ্ন করিলেন, এই যে শ্লোকের উৎপত্তি হইল, এই শ্লোকে আপনি নিশ্চয়ই একটি মহাকাব্য রচনা করিবেন। আমার কৌতূহল হইতেছে যে, কোন্ দেবতার জীবনী বা কীর্ত্তি অবলম্বন করিয়া আপনি সেই মহাকাব্য লিখিবেন?

"এই ছন্দে গাঁথি ল'য়ে কোন্ দেবতার যশঃ কথা
স্বর্গের অমরে কবি মর্ত্ত্যলোকে দিবে অমরতা?"

মহর্ষি মাথা নাড়িয়া কহিলেন, না, দেবতা নয়। মানুষ চিরকালই

দেবতার স্তবগান করিয়া আসিতেছে, মানুষের যাহা কিছু স্তুতি সবই ত দেবতাদের জন্য। হে দেবর্ষি, আপনি ত সর্ব্বজ্ঞ, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আপনার অবাধ গতি—বলুন ত, এমন মানুষ কে আছে পৃথিবীতে, যাঁহার চরিত্র লোকোত্তর, মানুষের মধ্যে দেবসদৃশ, কোন কলঙ্ক যাঁহার নামের সহিত জড়িত নাই? এমন মানুষটি কে?

"কহ মোরে বীর্য্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্ম্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো
মহৈশ্বর্য্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত;
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে সবার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম—
কহ মোরে সর্ব্বদর্শী হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্যনাম।"
নারদ কহিলা ধীরে—"অযোধ্যার রঘুপতি রাম।"

—(রবীন্দ্রনাথ)

মহর্ষি বাল্মীকি সাগ্রহে কহিলেন, হাঁ, হাঁ, আমি তাঁহার নাম শুনিয়াছি বটে, কিন্তু আমি ত তাঁহার সম্পূর্ণ ইতিহাস জানি না। কেমন করিয়া সে-কাহিনী লিখিব? কোথায় পাইব আমি সে পরমপুরুষের জীবন-কাহিনী?

নারদ কহিলেন, ব্রহ্মার বরে আপনি নিজের মানস-চক্ষেই রামচন্দ্রের সমগ্র কাহিনী দেখিতে পাইবেন। এমন কি, যাহা ঘটে নাই, তাহাও পিতামহের বরে আপনার নিকট প্রত্যক্ষ হইবে। হে মহর্ষি! আপনি আরম্ভ করুন সেই মহাকাব্য—সমস্ত বিশ্ববাসী সেই গ্রন্থের অপেক্ষায় রহিল।

নারদের প্রস্থানের পর মহর্ষি বাল্মীকি ধ্যানমগ্ন হইলেন। নিজের কল্পনায় সেই লোকোত্তর মহাপুরুষের জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া শুরু করিলেন তাঁহার মহাকাব্য।

একটির পর একটি সুললিত মধুর ছন্দে শ্লোক রচনা করিয়া তিনি রামায়ণ অর্থাৎ রাম-চরিত্র লিখিয়া চলিলেন। কখনও নিজের রচনায় নিজেই শিহরিয়া উঠেন, কখনও রামচন্দ্রের দুঃখে তাঁহার হৃদয়ে নিদারুণ বেদনা বাজে, লেখা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দেন, কিছুদিন পরে কাব্য-রচনা আবার ধীরে ধীরে শুরু করেন। এইভাবে ভারতের মহাগ্রন্থ একদিন সম্পূর্ণ হইল।

সেই অপূর্ব্ব কাব্যের কাহিনীই আজ বর্ণনা করিব।

বংশ-মাহাত্ম্য

ভগবান লোকপাবন রামচন্দ্র হিন্দুশাস্ত্র মতে স্বয়ং ভগবানের অবতার। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, মর্ত্ত্যলোকবাসীর নিজের কর্ম্মফলেই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক—মানুষের দুঃখ যখন প্রবল হইয়া উঠে, তখন ভগবান মানুষ বা অন্য কোন রূপ ধরিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া মানুষের দুঃখ দূর করেন। মৎস, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ এই ন'জন অবতার ইতিপূর্ব্বেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে এই সৃষ্টি ধ্বংস হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই আর একজন জন্ম লইবেন—তাঁহার নাম কল্কি।

অন্যান্য অবতারদের কথা এখানে আলোচনা করিব না। তবে রামচন্দ্রকে অবতার বলিবার কারণ বোধ হয় তাঁহার অলৌকিক চরিত্র। সাধারণ মানবের অপেক্ষা বহু বিষয়ে অধিক গুণসম্পন্ন কোন লোককে দেখিলে,

বিস্মিত মানুষ যে তাঁহাকে দেবসম্ভূত বলিয়া ভাবিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? সে যাহা হউক, কিন্তু এই যে রাজা, যাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়াই সকলে ভাবে, তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিলেন তাহাও নিশ্চয় সাধারণ নয়। তাহাকে বলিত, বলিত কেন, এখনও বলে— সূর্য্যবংশ! যে সূর্য্য আকাশে উঠিয়া প্রতিদিন আলো এবং তাপ দিয়া আমাদের রক্ষা করেন, হিন্দুরা তাঁহাকে শুধু অগ্নিপিণ্ড বলিয়া মনে করেন না, তাহাদের বিশ্বাস মতে তিনি একজন দেবতা।

সূর্য্যের পুত্র বৈবস্বত মনুর সন্তান-সন্ততিই যদিচ মানব বা মনুষ্য নামে অভিহিত হইল, অর্থাৎ সমস্ত মানবই সূর্য্যবংশ সম্ভূত হইলেও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হইতে যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইল, তাহাকেই সূর্য্যবংশ নামে অভিহিত করা হইত।

সূর্য্যবংশের নরপতিগণ বল-বিক্রম ও মহত্বে ভারতের সমস্ত নৃপতিগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনীর কথা বলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে। তবে দুই একজনের নাম করিব। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, স্বয়ং দেবতারা বিপদে পড়িলে বারবার সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, একথা বহু পুরাণে উল্লিখিত আছে।

সূর্য্যবংশের উল্লেখযোগ্য নৃপতিগণের মধ্যে প্রথম হইলেন কাকুৎস্থ। দেবরাজ ইন্দ্র একবার অসুরগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া এই রাজার সাহায্য চান। দেবরাজ নিজে ষাঁড়ের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার বাহন হন। তাঁহার ককুৎ অর্থাৎ পৃষ্ঠের চর্ম্মপিণ্ডের উপর বসিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং অসুরদের পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হয় কাকুৎস্থ।

ইহার পরেই আর একজন যে বিখ্যাত রাজার কথা বলিব তাঁহার নাম মান্ধাতা। এখনও লোকে কথায় কথায় 'মান্ধাতার আমল' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। এই রাজাটির জন্মের রহস্য বড় অদ্ভুত। পিতার উরু

চিরিয়া ইহার জন্ম হয় বলিয়া ইহার মা ছিল না। নবজাত শিশু কি করিয়া বাঁচিবে এই দুর্ভাবনা উপস্থিত হওয়ায়, স্বয়ং ইন্দ্র তাঁহার অঙ্গুলিতে অমৃত মাখাইয়া জাতককে চুষিতে দেন। তাহাতেই শিশুটি মানুষ হইয়া উঠিল। সেই অমৃতের জোরেই হউক আর যে কোন কারণেই হউক—তিনি এত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন যে সমস্ত পৃথিবীতে তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

মান্ধাতার পর যিনি উল্লেখযোগ্য তিনি হইলেন মহারাজা ত্রিশঙ্কু। ত্রিশঙ্কুর অবস্থা বলিয়া উভয়-সঙ্কটে পতিত লোককে অনেকেই পরিহাস করিয়া থাকে। ত্রিশঙ্কুর হঠাৎ খেয়াল হয়, তিনি সশরীরে স্বর্গে যাইবেন। এতদর্থে তিনি প্রচণ্ড যজ্ঞ শুরু করিলেন। আর সে-যজ্ঞের পুরোহিত হইলেন স্বয়ং ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র, যিনি নিজে ক্ষত্রিয় হইয়াও তপস্যার জোরে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র কিরূপে ক্ষত্রিয় রাজা হইয়াও ব্রহ্মর্ষি হইলেন, এই প্রসঙ্গে তাহা বলিতেছি।

সেকালের আর্য্যরা কাজের সুবিধার জন্য নিজেদের সবাইকে চারি জাতিতে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। এই চারিটি জাতির নাম—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণের কাজ ছিল—ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া সকল সময় ভগবানের নাম করা ও সকল লোককে ভাল পথে চলিতে উপদেশ দেওয়া। ক্ষত্রিয়ের কাজ ছিল—রাজ্য-শাসন করা ও শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা। বৈশ্যদের কাজ ছিল—ব্যবসা-বাণিজ্য চালান ও শস্য উৎপন্ন করা; আর শূদ্ররা ওই তিন জাতির কার্য্যেই সাহায্য করিত ও তাহাদের সাধ্যমত সেবা করিত। সমাজে সকল জাতিরই সমান আদর ছিল বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণ নিজের চরিত্রগুণে অন্য তিন জাতির নিকট শ্রদ্ধা পাইতেন। মুনি-ঋষিরা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন।

ব্রাহ্মণের সম্বল ছিল গভীর মনের বল; আর ক্ষত্রিয়ের পুঁজি ছিল—যথেষ্ট দেহের বল। মনের বল বড় না দেহের বল বড়, ইহার চমৎকার

পরীক্ষা হইয়াছিল বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে। বশিষ্ঠ ছিলেন একজন ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণ—ঋষি; ভগবানের তপস্যা করিয়া তাঁহার মনের জোর হইয়াছিল খুব বেশী রকমের। বনের ভিতর গাছ-পালা লতা-পাতায় ঘেরা তাঁহার সুন্দর শান্তিময় আশ্রম। আশ্রমে থাকেন—তিনি, তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী অরুন্ধতী, আর এক শত পুত্র। এই সঙ্গে তাঁহাদের একটি গাই ছিল। তাহার আবার অদ্ভুত গুণ! তাহার কাছে যে কোন জিনিষ যত খুশি চাহিবামাত্র, সে নিজের পেট হইতে বাহির করিয়া দিত। এই গরুর নাম কামধেনু। বশিষ্ঠ আদর করিয়া এই গাভীটির নাম রাখিয়াছিলেন 'শবলা'।

কনৌজের রাজা বিশ্বামিত্র ছিলেন জাতিতে ক্ষত্রিয়। তিনি একবার নিজের ছেলেপুলে, সৈন্যসামন্ত লইয়া বশিষ্ঠের আশ্রমে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ এতগুলি লোককে অল্পক্ষণের মধ্যেই নানা রকম রাজভোগ খাওয়াইয়া তৃপ্ত করিলেন। রাজা বিশ্বামিত্র এই ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। শেষে শুনিলেন যে, শবলা নামী গাইয়ের গুণে এই অসম্ভব কাণ্ড ঘটিয়াছে। তখন তিনি বশিষ্ঠকে বলিলেন, "ঋষি, আমি এই গরুটিকে লইয়া যাইতে চাই। ইহার বদলে আপনাকে এক লক্ষ গরু দিব। তা' ছাড়া আপনাকে আরও অনেক দামী দামী উপহার দিব।" বশিষ্ঠ উত্তর দিলেন, "আমি ঈশ্বর-ভক্ত ব্রাহ্মণ, আমার ধনরত্নে লোভ নাই। শবলা আমার মেয়ের চেয়েও বেশী স্নেহের পাত্রী। উহাকে আমি প্রাণ থাকিতে ছাড়িতে পারিব না।"

বিশ্বামিত্র তখন গায়ের জোরে সেই গাভীটিকে লইয়া যাইতে চাহিলেন। তখন বশিষ্ঠের ইচ্ছানুসারে শবলার দেহ হইতে হাজার হাজার সৈন্য বাহির হইয়া পড়িল। তাহারা বিশ্বামিত্রের সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করিয়া তাহাদের সকলকে হটাইয়া দিল। বিশ্বামিত্রের অপমানের আর সীমা রহিল না।

তিনি নিজের রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া মহাদেবের তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপস্যায় মহাদেব খুশী হইয়া, তাঁহাকে অনেকগুলি মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র উপহার দিলেন। আবার বশিষ্ঠের সহিত নূতন তেজে যুদ্ধ চলিল।

একদিন বিশ্বামিত্র তাঁহার দলবল লইয়া বশিষ্ঠের আশ্রমের নিকট আসিয়া, চতুর্দ্দিক হইতে অস্ত্রবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠের নিকট ছিল একখানা মন্ত্রপূত লাঠি—তাহার নাম 'ব্রহ্মদণ্ড'। ব্রহ্মদণ্ড ঘুরাইয়া বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের সমস্ত অস্ত্র ফিরাইয়া দিলেন, একটিও তাঁহার গায়ে লাগিল না। তারপর তাঁহার শরীর হইতে এমন তেজ বাহির হইতে লাগিল যে, কেহই তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতে পারিল না।

এতদিনে বিশ্বামিত্র বুঝিলেন, ব্রাহ্মণের বলের নিকট ক্ষত্রিয়ের বল তুচ্ছ। তিনি তখন ব্রাহ্মণের মত মনের তেজ ও ঋষির মত সদ্‌গুণ লাভ করিবার জন্য রাজ্যপাট্ ফেলিয়া রাখিয়া, হিমালয় পর্ব্বতে গিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। লোভ, অহঙ্কার আর ক্রোধ—এই তিনটিই বিশ্বামিত্রের প্রধান দোষ ছিল। তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার এই দোষ তিনটি অন্তর্হিত হইল। তিনি "রাজর্ষি" উপাধি পাইয়াছিলেন বটে; কিন্তু "ব্রহ্মর্ষি" আরও বড় উপাধি। তাই ব্রহ্মর্ষি হইবার সঙ্কল্প করিয়া, কৌশিকী নদীর তীরে বহুদিন ধরিয়া একমনে সাধন-ভজন করিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ভগবান একদিন বশিষ্ঠের রূপ ধরিয়া তাঁহার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তখনই তাঁহার পা-ধুইবার জল আনিয়া দিলেন, ভাল আসনে বসিতে দিলেন; তারপর তাঁহার সেবার জন্য নিজের হাতে পায়স রাঁধিতে লাগিলেন। পায়স রাঁধিতে একটু দেরি হইয়া গিয়াছিল; তাহার আগেই বশিষ্ঠ-রূপী ভগবান অন্য মুনিদের দেওয়া খাবার খাইয়া পেট ভরাইয়া ফেলিয়াছেন। বিশ্বামিত্র যখন গরম গরম পায়স রাঁধিয়া তাঁহার কাছে লইয়া আসিলেন, তখন ছদ্মবেশী ভগবান্ বলিলেন,



দেবরাজ আদেশ করিলেন, স্বর্গে তুমি আসিতে পারিবে না, নামিয়া যাও। রামায়ণ—পৃঃ ১৮

"আমার খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে, তুমি পায়সের থালা হাতে করিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াও, আমি একটু পরে আসিয়া খাইব।"

বিশ্বামিত্র সেইভাবেই থালা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; কিন্তু বশিষ্ঠরূপী ভগবানের আর দেখা নাই। বশিষ্ঠ তাঁহার আগেকার অপরাধ বুঝি ক্ষমা করেন নাই—এই ভাবিয়া বিশ্বামিত্রের চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। অনেকদিন পরে ছদ্মবেশী ভগবান্ ফিরিয়া আসিয়া দেখেন—বিশ্বামিত্র সেইভাবেই পায়সের থালা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন! তাঁহার এই অসাধারণ ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা দেখিয়া, ভগবান সন্তুষ্ট হইয়া পায়সটুকু খাইলেন এবং বিশ্বামিত্রকে ব্রহ্মর্ষি করিয়া দিলেন। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়া, এইরূপে নিজের সাধনার বলে ব্রাহ্মণের পদবী পাইলেন।

ঋষি বশিষ্ঠ অনেকদিন আগেই বিশ্বামিত্রকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। এবার তিনি বিশ্বামিত্রকে বন্ধুভাবে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন!

যাহা হউক—ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞ ত শুরু হইল। বিশ্বামিত্রের মন্ত্রবলে ত্রিশঙ্কু স্বর্গের পথে উঠিতে শুরু করিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে দেবরাজ গেলেন দারুণ চটিয়া। তিনি আদেশ করিলেন, "স্বর্গে তুমি আসিতে পারিবে না, নামিয়া যাও।" ত্রিশঙ্কু আবার যেমন নামিতে লাগিলেন, বিশ্বামিত্রও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "তিষ্ঠ, অর্থাৎ ঐখানেই থাক।"

দেববাক্য মিথ্যা হইবার নয়, ঋষিবাক্যও তাই। সুতরাং সেই হইতে ত্রিশঙ্কু মহাশূন্যেই অবস্থান করিতেছেন। বিশ্বামিত্র অবশ্য তাঁহার বাসের জন্য সেইখানেই একটা স্বতন্ত্র নক্ষত্রালোক করিয়া দিয়াছিলেন।

ত্রিশঙ্কুর পরেই ঐ বংশের আর একজন রাজার কথা বলা উচিত, তিনি হইলেন বিখ্যাত রাজা হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্চন্দ্র নিজ-বাহুবলে সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। হয়ত সেই কারণে তাঁহার একটু দম্ভও হইয়াছিল।

কিন্তু সেই যজ্ঞের জন্য তিনি যে শাস্তিভোগ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে দুঃখিত না হইয়া পারা যায় না।

হরিশ্চন্দ্র কখনও প্রার্থীকে বিমুখ করেন না—এই কথা চারিদিকে রটিয়া গিয়াছিল। একদিন ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রকে পরীক্ষা করিবার মানসে তাঁহার সভায় আসিয়া কহিলেন, তুমি ত খুব দাতা শুনিয়াছি, আমাকে কিছু দান করিবে?

হরিশ্চন্দ্র ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া উত্তর দিলেন, কি চাই আপনার বলুন। এখনই দিব।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, এই সসাগরা পৃথিবীই আমি চাই—আমাকে দান কর।

কি আর করেন! হরিশ্চন্দ্র তৎক্ষণাৎ কহিলেন, বেশ, আপনি তাহাই লউন। কে কোথায় আছ, জল আন, আমি পৃথিবীতে আমার যা কিছু আছে দান করিব।

দানের অনুষ্ঠান শেষ হইলে বিশ্বামিত্র 'স্বস্তি' বলিয়া দান গ্রহণ করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, ব্রাহ্মণকে দান করিলেই দক্ষিণা দিতে হয়। কৈ, আমার দক্ষিণাটা?

হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, নিশ্চয়ই। ওরে কে কোথায় আছিস—কোষাগার হইতে একসহস্র স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া দে!

বিশ্বামিত্র কহিলেন, আস্তে, বাপু আস্তে! তুমি এইমাত্র মন্ত্র পড়িয়া তোমার যথাসর্ব্বস্ব দান করিলে! তবে কোষাগার হইতে স্বর্ণমুদ্রা আনিতে বলিতেছ কাহাকে? উহা ত আমার টাকা! ও-টাকাতে তোমার অধিকার কি?

হরিশ্চন্দ্র বিস্ময়-বিমূঢ়···নির্ব্বাক!

সভাসদেরা হায় হায় করিয়া উঠিলেন। অপর মুনিঋষিরা দয়া করিবার

জন্য বিশ্বামিত্রকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিশ্বামিত্র অটল। দক্ষিণা চাই-ই।

হরিশ্চন্দ্র তখন শুষ্কমুখে কহিলেন, তাহা হইলে আমার ঋণ-শোধের উপায় আপনিই করিয়া দিন—

বিশ্বামিত্র কহিলেন, আমি ওসব কথা জানি না। আমার দক্ষিণার টাকা যেমন করিয়া হউক আনিয়া দাও। শুধু তাহাই নয়, এ-পৃথিবী এখন আমার অধিকারে—তুমি ও তোমার স্ত্রী-পুত্র এ-পৃথিবী হইতে দূর হইয়া যাও।

সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ! কিন্তু শেষের সমস্যাটার উপায় হইল। পণ্ডিতেরা বলিলেন, কাশীধাম পৃথিবী ছাড়া। সুতরাং সেখানে বাস করিলেই পৃথিবীর বাহিরে বাস করা হইবে।

রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র অগত্যা স্ত্রী-পুত্র লইয়া কাশীতেই যাত্রা করিলেন। বিশ্বামিত্র কিন্তু তাঁহার পথরোধ করিয়া কহিলেন, আমার ঋণ শোধ না করিয়া কোথায় যাও?

হরিশ্চন্দ্র বিনয় করিয়া কহিলেন, আমাকে মাত্র সাত দিনের সময় দিন, আমি যেমন করিয়া পারি ঐ অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিব।

সৌভাগ্যবশতঃ বিশ্বামিত্র এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন হরিশ্চন্দ্র এক-বস্ত্রে স্ত্রী শৈব্যা এবং পুত্র রোহিতাশ্বকে সঙ্গে করিয়া কাশীধামে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া হাটে এক ব্রাহ্মণের কাছে স্ত্রী ও পুত্রকে বিক্রয় করিলেন কিন্তু তাহাতেও দক্ষিণার অর্দ্ধেক মূল্য মাত্র উঠিল। বাকী অর্দ্ধেকের জন্য নিজেকেই এক চণ্ডালের নিকট বিক্রয় করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে বিশ্বামিত্রের দক্ষিণা পরিশোধ করিলেন।

কত বড় লোকের কি শোচনীয় দুর্দ্দশা হইল! সমস্ত সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর যিনি, সারা বিশ্ব যাঁহার পদানত, তাঁহাকে নিজের স্ত্রী-পুত্রকে দাস-দাসীরূপে অপরের কাছে বিক্রয় করিতে হইল এবং তিনি নিজে মণিবণিকা

নামক কাশীর শ্মশান-ঘাটের এক চণ্ডালের ক্রীতদাসত্ব করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও বিশ্বামিত্রের দয়া হইল না, তখনও তাঁহার পরীক্ষা শেষ হয় নাই।

এইভাবে জীবন-যাপন করিতে করিতে ইঁহাদের দুঃখের চূড়ান্ত হইল সেইদিন, যেদিন সপ্তমবর্ষীয় বালক রোহিতাশ্বের সর্পাঘাতে মৃত্যু হইল। শৈব্যা স্বামীকে আগেই হারাইয়াছিলেন, এক্ষণে একমাত্র পুত্রকে হারাইয়া শোকে আকুল হইলেন, কিন্তু উপায় কি, মৃতপুত্রের সংকার ত করিতে হইবে। যে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তাঁহার দাসত্ব করিতেন, তিনি সংকারের খরচ দিতে সম্মত হইলেন না। শৈব্যা একাই মৃত পুত্রকে বহন করিয়া শ্মশান-ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দৈবের বিড়ম্বনা, সেইদিনই হরিশ্চন্দ্র সেই সময় ঘাট পাহারা দিতেছিলেন। তিনি প্রথমে শৈব্যাকে চিনিতে না পারিয়া চণ্ডাল-প্রভুর নাম করিয়া শ্মশানের খরচা চাহিলেন। শৈব্যা তখন আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সেই সময়ে বিদ্যুৎস্ফুরণের আলোকে উভয়েই উভয়কে চিনিতে পারিলেন। সেই দারুণ আঘাতে হরিশ্চন্দ্র মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন।

এইরূপ জীবন-যাপন করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয় স্থির করিয়া হরিশ্চন্দ্র যখন সঙ্কল্প করিতেছেন যে তিনি ও শৈব্যা রোহিতাশ্বের দেহ কোলে করিয়া প্রজ্বলিত চিতায় আরোহণ করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইবেন সেই সময় ধর্ম্ম ও বিশ্বামিত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বামিত্রও হরিশ্চন্দ্রের পরীক্ষায় তখন অতীব তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি সমস্ত রাজত্ব হরিশ্চন্দ্রকে ফিরাইয়া দিলেন। দেবতার বরে রোহিতাশ্বও বাঁচিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল মনিব উভয়েই তাঁহাদের দাসত্ব হইতে মুক্তি দিলেন। হরিশ্চন্দ্রের সুখের দিন আবার ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীর এইখানেই শেষ নয়। কথিত আছে,

হরিশ্চন্দ্র এত ধার্ম্মিক ছিলেন এবং এমন সুচারুভাবে প্রজা পালন করিয়াছিলেন যে, সেই পুণ্যে মৃত্যুর পর তিনি সশরীরে স্বর্গে যান। কিন্তু শুধু নিজে স্বর্গে গিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, সঙ্গে আরও অনেকগুলি জীবকে লইয়া চলিলেন। তাহার মধ্যে মনুষ্যেতর প্রাণীও ছিল। এমনই তাঁহার পুণ্যের প্রভাব যে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে বাধা দিতে পারিলেন না, অথচ হরিশ্চন্দ্রের দৌলতে অতগুলি প্রাণী স্বর্গে আসিয়া হাজির হয়—এ-ব্যাপারও তাঁহার ঠিক পছন্দ হইল না। তখন তিনি নিজে কোন ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া দেবর্ষি নারদের শরণাপন্ন হইলেন।

এই সব কূট বুদ্ধির ব্যাপারে দেবর্ষির যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। তিনি স্বর্গের দ্বারপথে দাঁড়াইয়া নিতান্ত নির্বোধের মত ভান করিয়া হরিশ্চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ, আপনি এতগুলি প্রাণীসহ সশরীরে স্বর্গে আসিতেছেন, তাহা হইলে পুণ্য ত আপনি কম করেন নাই! এত কি পুণ্য করিলেন, মহারাজ?

হরিশ্চন্দ্র তাঁহার চতুরতা না বুঝিয়াই মহা উৎসাহে নিজের কীর্ত্তিকলাপ বিবৃত করিতে লাগিলেন। তিনি নারদের প্ররোচনায় ভুলিয়া গেলেন যে, পুণ্য-কর্ম্ম করিয়া নিজ-মুখে বলিলে পুণ্যফল নষ্ট হয়। ফলে যেমন এক একটি কীর্ত্তির কথা বলিতে লাগিলেন, তেমনি একটু একটু করিয়া তাঁহার অধঃপতন ঘটিতে লাগিল।

খানিকটা নামিয়া আসিবার পর তাঁহার চৈতন্য হইল। তখন তিনি চুপ করিলেন কিন্তু তখন আর স্বর্গে যাইবার মত পুণ্য তাঁহার নাই। তিনি তাঁহার আশ্রিত জীবগুলিকে ত্যাগ করিয়া, একাকী স্বর্গে যাইতেও রাজি হইলেন না। সেইদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত তিনি নাকি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মাঝামাঝি এক স্থানে অবস্থান করিতেছেন।

সূর্য্যবংশীয় আর একটি রাজার কাহিনী বলিয়া আমরা মূল আখ্যায়িকা

শুরু করিব। তিনি আর কেহ নহেন—ভগীরথ। হিন্দুদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা পুণ্যদায়িনী নদী, ভারতবর্ষের সর্ব্বাধিক বিখ্যাত নদী গঙ্গাকে নাকি এই ভগীরথই পৃথিবীতে আনিয়াছিলেন।

হরিশ্চন্দ্রের পৌত্র সগরের ষাট হাজার পুত্র ছিল। এই ছেলেগুলি সকলেই যোদ্ধা এবং বীর ছিল। এতগুলি ছেলের ভুজবলের উপর নির্ভর করিয়া সগররাজা অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। এই যজ্ঞের নিয়ম আছে যে, এক বৎসর ধরিয়া একটি মন্ত্রঃপূত অশ্ব পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইবে। যেখানে যেখানে ঐ ঘোড়াটি যাইবে, সেখানকার রাজারা যদি ঘোড়াটিকে কিছু না বলেন ত বুঝা যাইবে যে সেই রাজারা যজ্ঞকর্ত্তার বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু কেহ যদি ঐ ঘোড়াটিকে ধরেন কিম্বা বাঁধিয়া রাখেন, তাহা হইলে অশ্বরক্ষকগণকে সেই রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া হারাইতে হইবে এবং ঘোড়াটিকে আবার ছাড়িয়া দিতে হইবে। এইভাবে এক বৎসর কাটিয়া গেলে ঐ অশ্বটীকে বধ করিয়া তাহার মাংস যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয়।

সগররাজা তাঁহার যজ্ঞাশ্বের সঙ্গে ষাট হাজার ছেলেকে রক্ষক স্বরূপ পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত তাঁহার পূর্ব্বে কোন কারণে বিবাদ ঘটিয়াছিল। তিনি সেই সময়ে সুযোগ বুঝিয়া একদিন অশ্বটি চুরি করিলেন। সগরের পুত্রেরা, কে ঘোড়া লইয়াছে বুঝিতে না পারিয়া, নিকটে কপিল-মুনি বসিয়া তপস্যা করিতেছিলেন, তাঁহাকেই মারিয়া বসিল। কপিল-মুনির ধ্যান ভঙ্গ হওয়াতে তিনি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ষাট হাজার যুবক একেবারে ভস্মসাৎ।

সগর সংবাদ পাইয়া শোকে জ্ঞান হারাইলেন। তাঁহার পৌত্র অংশুমান আসিয়া কপিল-মুনির হাতে-পায়ে ধরিয়া অনেক অনুনয়-বিনয় করিবার পর কপিল প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, যদি জননী গঙ্গা কোন দিন মর্ত্ত্যে আসেন এবং

তাঁহার জল ঐ ভস্মাবশেষ স্পর্শ করে, তাহা হইলেই উহাদের উদ্ধার হইবে, নচেৎ নহে।

অংশুমান তখন নূতন বিপদে পড়িলেন। গঙ্গা আনার কাজটা ত সহজ নয়। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে গঙ্গার ইতিহাসটি তোমাদের জানা দরকার।

একবার ব্রহ্মা ও বিষ্ণু মহাদেবের গান শুনিতে যান। মহাদেব হইতেছেন বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁহার গান ত অপূর্ব্ব হইবেই—বিষ্ণু সেই মধু গান শুনিতে শুনিতে একেবারে দ্রবীভূত হইয়া গেলেন। স্বয়ং বিষ্ণুর দেহ হইতে যে জল বাহির হইল, তাহা পরম পবিত্র জ্ঞান করিয়া ব্রহ্মা তাঁহার বিশাল কমণ্ডলুতে ভরিয়া রাখিয়া দিলেন। সেই জলই গঙ্গা—গঙ্গা সেই হইতে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতেই বাস করিতেছিলেন।

এহেন গঙ্গাকে আনা অংশুমানের ক্ষমতায় কুলাইল না। কিন্তু তাঁহার পুত্র ভগীরথ বাল্যকাল হইতে কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে গঙ্গাকে প্রার্থনা করিলেন।

ব্রহ্মা গঙ্গাকে দিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু তখন আর একটি সমস্যা দেখা দিল। গঙ্গা যখন কমণ্ডলু হইতে পড়িবেন, তখন ভীষণ বেগে পড়িবেন। সে বেগ সহ্য করিবে কে?

ব্রহ্মা কহিলেন, একমাত্র যিনি পারেন, তিনি মহেশ্বর শিব নিজে। তুমি তাঁহারই নিকট যাও—

ভগীরথ তখন বহু অনুনয়ে শিবকেও তুষ্ট করিলেন। শিব তাঁহার জটায় গঙ্গার বেগ ধারণ করিলেন এবং পরে তাঁহার জটা হইতে সেই স্বর্গীয় নদীর ধারা হিমালয়-পর্ব্বত ভেদ করিয়া হরিদ্বার সমতলে নামিয়া আসিল। গঙ্গার জলে সগরের পুত্রগণের ভস্মস্তূপ ধুইয়া গেল। এতদিন পরে তাহাদের পরলোকে গতি হইল। ভগীরথের দ্বারা আনীত বলিয়া গঙ্গার আর এক নাম 'ভাগীরথী'।

অযোধ্যা

ভগবান রামচন্দ্র যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সূর্য্য-বংশের বিবরণ এতক্ষণ বলিয়াছি, এইবার তাঁহার জন্মভূমি অযোধ্যার কথা কিছু বলিব।

এখন যে অযোধ্যা রেল-কোম্পনীকে সামান্য কিছু অর্থ দিয়াই দেখিতে পাওয়া যায়, বলা বাহুল্য তখনকার দিনে অযোধ্যা ঐরূপ ছিল না। এখন অযোধ্যা শ্রীহীনা নগরী। কতকগুলি পুরাতন বাড়ী, ধূলিময় কয়েকটি রাস্তা, অসংখ্য বানর এবং কতিপয় পাণ্ডা—অযোধ্যা গেলে এখন ইহাই মাত্র নজরে পড়ে। কিন্তু তখন ইহার শ্রী ছিল অন্যরূপ। প্রবল প্রতাপান্বিত সূর্য্য-বংশের বিখ্যাত রাজধানী অযোধ্যা নাকি সুরলোকবাসী দেবতারও ঈর্ষার বস্তু ছিল।

কাশী হইতে কিছু উত্তরে সরযূ নামক গঙ্গারই এক উপনদীর তীরে অযোধ্যা অবস্থিত। অযোধ্যা যে-দেশের রাজধানী, সে দেশকে বলিত উত্তর-কোশল। কাশীর উত্তরে হিমাচল পর্য্যন্ত বিস্তৃত উর্ব্বরা সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য-শালিনী বিস্তৃত ভূমিখণ্ডই ছিল উত্তর কোশল এবং ত্রিশঙ্কু, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি বিখ্যাত নরপতিগণ এই উত্তর-কোশলেরই অধিপতি ছিলেন।

রামায়ণ ও অন্যান্য পুরাণে আমরা অযোধ্যার যে বর্ণনা পাই, তাহাতে আমরা জানিতে পারি যে, অযোধ্যার দৈর্ঘ্য এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রায় আটচল্লিশ ক্রোশ অর্থাৎ ইংরাজী মতে ছিয়ানব্বই মাইল লম্বা ছিল এবং প্রস্থে ছিল বার ক্রোশ। তোমরা কল্পনা কর, এত বড় একটা শহরের প্রত্যেকটি রাস্তা সুনির্ম্মিত ও সুরক্ষিত এবং তাহার চারিদিকের প্রত্যেকটি বাড়ীই প্রাসাদ-তুল্য। দারিদ্র্যের চিহ্ন নাই, দুঃখের লেশমাত্র নাই—মিথ্যা বা অনাচারের একটী কণাও নাই। ফুলের বাগান, নৃত্যশালা, চিত্রাগার প্রভৃতিতেও সমস্ত শহরটি যেন চিত্রে অঙ্কিত অমরাবতীর মত মনে হইত।

অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের ত কথাই নাই। বিপুল সাত-মহলা প্রাসাদ, তাহার মধ্যে হস্তীশালায় সহস্র হস্তী, লক্ষ লক্ষ ঘোড়া, প্রহরী পদাতিকে পূর্ণ অসংখ্য সৈন্যাবাস। নগরের পরিখা-বেষ্টিত প্রাচীরে সর্ব্বদা সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিত এবং তাহাদের সুবিধার জন্য শতঘ্নী নামক কামানের মত অস্ত্র সুসজ্জিত থাকিত।

নগরের ভিতরে শুধু নাট্যশালা বা উদ্যানই ছিল না—বিদ্যামন্দির ছিল। বড় বড় শিক্ষায়তনে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা নগর-বাসীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। রাজকর্ম্মচারীদের সুশাসনে দস্যু-তস্করের উপদ্রব ছিল না, মিথ্যা-বাদীর সংখ্যাও ছিল খুব অল্প। এক কথায় মানুষ যেমন স্থানে সর্ব্বতোভাবে সুখী থাকিবার স্বপ্ন দেখে, অযোধ্যা ছিল তেমনিই স্থান।

এই নগর অযোধ্যা। এই অযোধ্যা আর উত্তর-কোশলের রাজা দশরথ—তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র। এই রামচন্দ্রের কাহিনীই আজ বলিব।

রামচন্দ্রের জন্ম-কাহিনী

রাজা দশরথ ছিলেন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী, সূর্য্য-বংশের উপযুক্ত বংশধর। তাঁহার পিতা রাজা অজ অসুরদের সহিত যুদ্ধ করিয়া দেবতাদের প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। দশরথকেও একাধিকবার দেবতারা ডাকিয়াছিলেন সাহায্যের জন্য।

রাজা শুধু বীরই ছিলেন না, বিচক্ষণও ছিলেন—

তিনি নিজের ইচ্ছামত রাজকার্য্য কখনও করিতেন না। তাঁহার অনেকগুলি মন্ত্রী ছিল; এক-একজন মন্ত্রী এক-একটি বিশেষ বিভাগের কার্য্যভার লইয়া থাকিতেন। যেমন, কেহ শিক্ষা-কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন,

তাঁহার নাম ছিল, শিক্ষা-মন্ত্রী ; কেহ কৃষি-মন্ত্রী, কেহ শিল্প-মন্ত্রী, কেহ যুদ্ধ-মন্ত্রী, কেহ রাজ্য-মন্ত্রী। এই সকল মন্ত্রীর সঙ্গে দশরথ পরামর্শ করিয়া রাজকার্য্য চালাইতেন। রাজ্যের মধ্যে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে ও রাজনীতিতে যাঁহারা পরম পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগকেই মন্ত্রিত্বের গুরুভার দেওয়া হইত।

এই সকল মন্ত্রীরা সুদক্ষ গুপ্তচরের সাহায্যে রাজ্যের ও রাজ্যের বাহিরের সমস্ত সংবাদ আহরণ করিতেন। সেই সকল সংবাদের বলে শুধু যে শত্রুর আক্রমণ হইতে সতর্ক হইতে পারিতেন, তাহা নয়, প্রত্যেকটি প্রজার সুখ-দুঃখ, অসুবিধা বিবেচনা করিয়া উচিতমত ব্যবস্থা করিতেন। ফলতঃ রাজা এবং মন্ত্রীগণ সকলেই সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতেন যে, রাজকার্য্য নিজের বিলাস বা দৈহিক আরামের ব্যাপার নহে—কঠিন দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য। প্রজাদের মনোরঞ্জন ও তাহাদের স্বার্থরক্ষাই তাঁহাদের কাছে সকলের চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়।

যে দেশের রাজা এবং মন্ত্রীর মন এত বড়, সে দেশের চারিদিকে যে অক্ষয় সুখশান্তি বিরাজ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কী?

রাজা দশরথের বহু মহিষী ছিলেন। তন্মধ্যে তিনজন ছিলেন প্রধানা—কৌশল্যা জ্যেষ্ঠা, তিনিই সম্রাজ্ঞীপদবাচ্যা ; মধ্যমা কৈকেয়ী ছিলেন রাজা দশরথের অধিকতর প্রিয়-পাত্রী এবং কনিষ্ঠা মহিষীর নাম ছিল সুমিত্রা। মহিষীরা রূপে ও গুণে এবং বংশ-মর্য্যাদায়—সকল দিক দিয়াই রাজা দশরথের উপযুক্ত ছিলেন। হিন্দুপুরাণ অনুসারে ভগবান নিজেকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া এই তিন মহিষীর গর্ভেই চারিভ্রাতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহারা ত আর সামান্যা নহেন!

আদর্শ মহিষী পাইয়াও রাজা দশরথ ছিলেন অসুখী।

তাহার কারণ, রাজার সন্তানাদি নাই। মহিষীরা কত তপস্যা করিয়াছেন ভগবানের আরাধনা করিয়াছেন, কত কাঁদিয়াছেন, কত মানত করিয়াছেন, কিন্তু তবুও অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয় নাই—কোন রাণীই একটি সন্তান কোলে পাইলেন না।

অবশেষে রাজার কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং অপরাপর মন্ত্রিগণ একবাক্যে রাজাকে পুত্রেষ্টি নামক অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ মস্ত বড় যজ্ঞ। এ-যজ্ঞ সাধন করা যে সে লোকের কাজ ত নয়, বড় বড় রাজারাও পারেন নাই। মন্ত্রীরা বলেন, রাজা দশরথ রাজচক্রবর্ত্তী; তাই তাঁহার দ্বারা অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম্পন্ন হইতে পারে। যজ্ঞ যদি সুসম্পন্ন হয়, তবে রাজার সর্ব্বপ্রধান অভাবটিও যে ঘুচিয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাজা মন্ত্রীদের কথায় উৎসাহিত হইয়া অশ্বমেধে মত দিলেন। কিন্তু বিপদ হইল পুরোহিত লইয়া। কুলগুরু বশিষ্ঠ পুরোভাগে থাকিতে পারিতেন কিন্তু তাহা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ হয়। সুতরাং বাহির হইতে পুরোহিত আনিতে হইবে—অথচ এই গুরুভার বহন ত সকলের সাধ্যায়ত্ত নয়।

শেষে বশিষ্ঠ কহিলেন, অঙ্গদেশে মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গ আছেন; একমাত্র তিনিই অশ্বমেধ-যজ্ঞের পুরোহিত হইবার যোগ্য ব্যক্তি।

মন্ত্রিগণও বশিষ্ঠের কথায় সায় দিলেন। মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গকেই সকলে যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

মহারাজা দশরথের ইহাতে বড়ই আনন্দ হইল, কারণ রাজা জানিতেন, মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গকে সহজেই পাওয়া যাইবে। দশরথ রাজার এক বন্ধু ছিলেন, তাঁহার নাম লোমপাদ। মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁহারই জামাতা। বন্ধুর জামাতাকে পুরোহিত করিয়া আনা শক্ত হইবে না।

দশরথ বলিলেন, আপনারা যাঁহাকে পুরোহিত নির্ব্বাচিত করিলেন, তিনি আমার এক শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর জামাতা। আমি নিজে অঙ্গদেশে গিয়া তাঁহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের পুরোহিতরূপে বরণ করিয়া আনিব।

পুরোহিত স্থির হইল, এইবার যজ্ঞের স্থান-নির্ব্বাচনের কথা উঠিল।

সকলেই সরযূর তীরে যজ্ঞশালা নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। চারিদিকে নিমন্ত্রণ লইয়া রাজার লোক ছুটিল; খুব ধূম-ধামের সহিত

আয়োজন চলিতে লাগিল; রাজা স্বয়ং অঙ্গদেশে গিয়া মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া আনিলেন।

ক্রমে যজ্ঞশালা নির্ম্মিত হইল, সমস্ত আয়োজনও সম্পূর্ণ হইল, নিমন্ত্রিত হইয়া বহু রাজা, রাজপুত্র, মুনি, ঋষি, পণ্ডিত, যাজক, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষুক, অতিথি অযোধ্যার সরযূ-তীরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহাদের সকলকেই যথোপযুক্ত বাসস্থান দেওয়া হইল। যাহাতে কেহই না কোন দোষ ত্রুটি পান, আদর-অভ্যর্থনার না কোন ত্রুটী ঘটে, তাহার সমস্ত বন্দোবস্তই করা হইল। এতগুলি লোকের এত সুচারু ব্যবস্থা যে সম্ভব তাহা কেহ ইতিপূর্ব্বে ধারণা করিতে পারেন নাই।

যজ্ঞ আরম্ভ হইল।

এই যজ্ঞ অত্যন্ত কঠিন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং শেষ হইতে এক বৎসর সময় লাগিল। অশ্বমেধ-যজ্ঞ যখন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল, তখন মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গ রাজা দশরথকে বলিলেন, মহারাজ, আপনার যজ্ঞ-দর্শনে ত্রিভুবন-বাসী আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করিতেছেন। আপনি এই সময়ে পুত্রেষ্টি আহুতি প্রদান করুন; তাহা হইলেই যজ্ঞ সফল হইবে এবং পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সফল হইলে আপনি নিশ্চয়ই পুত্ররত্ন লাভ করিবেন।

রাজা পরমানন্দে সেই ব্যবস্থা করিলেন। তখন যজ্ঞে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। যজ্ঞ হইতেছে, যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ডে মহাতেজে আগুন জ্বলিতেছে, হঠাৎ সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্য হইতে এক সুবর্ণপাত্র হস্তে এক দীর্ঘকায় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ উত্থিত হইয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন —[illegible] মহারাজ দশরথ! ব্রহ্মা আপনার যজ্ঞে পরিতুষ্ট হইয়াছেন। তিনি প্রসন্ন হইয়া এই দেবভোগ্য, অসীমশক্তি-সম্পন্ন চরু বা পরমান্ন প্রেরণ করিয়াছেন। আপনার মহিষীরা স্নানান্তে ইষ্ট-পূজা সম্পন্ন করিয়া এই চরু গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলেই আপনার উদ্দেশ্য সফল হইবে।

রাজা দশরথ গদগদ চিত্তে কুণ্ডোত্থিত পুরুষকে প্রণাম করিয়া পাত্র লইলেন ; তাঁহার হস্তে পাত্র সমর্পণ করিয়াই অগ্নিময় মূর্ত্তি কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

যজ্ঞ সভাস্থলে কোলাহল উঠিল ; সকলেই আনন্দ করিতে লাগিলেন। রাজা দশরথ ব্রহ্মার বর পাইয়াছেন, ব্রহ্মা তাঁহাকে পরমান্ন পাঠাইয়াছেন, তাঁহার যজ্ঞ করা সার্থক হইয়াছে, এই কথা শুনিয়া সকলেরই আনন্দ হইল।

রাজা তখনি অন্তঃপুরে গিয়া সম্রাজ্ঞী কৌশল্যাকে অর্দ্ধেক পরমান্ন দিলেন ; তারপর রাজা রাণী কৈকেয়ীকে ডাকিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধেক তাঁহার হাতে দিলেন। সুমিত্রা সর্ব্বকনিষ্ঠা বলিয়া সকলেরই স্নেহভাগিনী ছিলেন। সুতরাং দেবী কৌশল্যা এবং কৈকেয়ী উভয়েই তাঁহাদের নিজ নিজ অংশ হইতে কিছু কিছু পরমান্ন ভাগ করিয়া তাঁহাকে দিলেন। ফলে তিন মহিষীই সেই অপূর্ব্ব চরু গ্রহণ করিতে সক্ষম হইলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে রাজ্যের লোক সংবাদ পাইল, রাণীরা গর্ভবতী হইয়াছেন। সেইদিন হইতেই রাজধানীতে উৎসব চলিতে লাগিল। রাজা যত খুশী, প্রজারাও তত খুশী। সূর্য্যবংশের বংশরক্ষা এতদিনে বুঝি সম্ভব হইল।

তাহার পর একদিন কৌশল্যা স্বপ্ন দেখিলেন—

স্বপ্নে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শার্ঙ্গধারী।
চতুর্ভুজরূপে দেখা দিলেন শ্রীহরি॥
পুত্রভাবে হরিকে করিল রাণী কোলে।
কহিলেন কৌশল্যারে ডাকিয়া মা বলে॥
পূর্ব্বেতে আমার সেবা করেছ আদরে।
সেই পুণ্যে জন্মিলাম তোমার উদরে॥
আপনি তোমার গর্ভে লয়েছি জনম।
পুত্র বলি স্তন দিয়া করহ পালন॥



স্বপ্নে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শার্ঙ্গধারী ।

চতুর্ভুজরূপে দেখা দিলেন শ্রীহরি ॥

রামায়ণ—পৃঃ ৩০

কৌশল্যা এই স্বপ্ন দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

আরও কয়েক মাস গত হইলে তিন রাণীর চারিটি পুত্র হইল। বড়রাণী কৌশল্যার একটি, মেজরাণী কৈকেয়ীরও একটি, কেবল ছোটরাণী সুমিত্রার দুইটি!

ছেলেদের রূপে ঘর আলো হইয়া উঠিল। সর্ব্বসুলক্ষণ কন্দর্পতুল্য পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে।

রাজা দশরথ আনন্দের আতিশয্যে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। রাণীরা রাজাকে ছেলে দেখিতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এত দিনে স্বামী দেবতার মনোকষ্টের অবসান করিতে পারিয়াছেন বলিয়া তাঁহারাও আনন্দসাগরে ভাসিতেছেন।

রাজধানীতে সেদিন যে কি মহোৎসব চলিল, তাহা আর কি বলিব? সে রাত্রে এমন আলো জ্বলিল যে লোকে রাত্রির অন্ধকারকে দিন বলিয়া মনে করিল। সমস্ত দিনরাত গান-বাজনা চলিল, কেবল দান-ধ্যান, কেবল পান-ভোজন! রাজা অর্থ-ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া দিলেন, গরীব-দুঃখীকে মুক্তহস্তে ধন-রত্ন বিতরণ করিলেন। ভিক্ষুক এত ভিক্ষা পাইল যে কোনদিন আর তাহাদের ভিক্ষা বোধ করি না করিলেও চলিবে!

ছেলেদের নাম-করণের সময় আসিল। কুলপুরোহিত রাজাকে সঙ্গে লইয়া রাজকুমারদের নাম-করণ করিতে চলিলেন। বড় রাণী কৌশল্যার ছেলে সকলের আগে হইয়াছে, সেই হইল বড় কুমার; বশিষ্ঠ তাহার নাম রাখিলেন রামচন্দ্র, মেজরাণীর ছেলেটি রামের পরে হইয়াছে, তিনি হইলেন মধ্যম কুমার, পুরোহিত তাহার নাম রাখিলেন ভরত; ছোট রাণীর দুটি ছেলে—দুটির মধ্যে যেটি বড়, তাহার নাম হইল লক্ষ্মণ, আর সব ছোটটির নাম হইল শত্রুঘ্ন।

রাজকুমারেরা দিন দিন শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।



রাম ও লক্ষ্মণ ব্যায়াম শিক্ষা করিতেছেন। বশিষ্ঠদেবের শিক্ষায় তাঁহারা সকল বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

রামায়ণ—পৃঃ ৩৪

শুধু রাজা বা রাজ-মহিষী নহেন, তাঁহারা সকলকারই নয়নানন্দ। আর ভাইদের মধ্যে ঐ অল্প বয়সেই যে প্রণয় জন্মিল তাহাতেই সকলে আরও আনন্দিত হইলেন।

ভাইদের মধ্যে যদি কেহ খেলিতে খেলিতে একটু দূরে গিয়া পড়িয়াছে, কি ছেলেমানুষি করিয়া কোথাও লুকাইয়াছে, অন্য তিনজনে কাঁদ কাঁদ হইয়া পড়ে। একদণ্ড কেহ কাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না। দেখিয়া রাজার মনে বড় শান্তি, বড় সুখ! রাণীদের হৃদয়ও এ-দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে ভরিয়া যাইত; তাঁহাদের তিন সতীনে যেমন তিনটি বোনের মত ভাব, তাঁহাদের ছেলেদের মধ্যেও যে তেমনই ভাব জন্মিয়াছে, ইহাতে মহারাজের মন একেবারে ভরপুর।

ছেলেদের যখন লেখাপড়া করিবার বয়স হইল, রাজা দশরথ তখন তাহাদের বশিষ্ঠদেবের নিকট রাখিয়া দিলেন। বশিষ্ঠদেব রাজকুমারদের শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাহারা চারিজনেই অসাধারণ-মেধাবী, তেমন মেধাবী ছেলে প্রায় জন্মে না। একে সূর্য্যবংশে, অয় ব্রহ্মার বরে জন্ম—কত যাগ-যজ্ঞের ফল স্বরূপ তাহারা জন্মিয়াছে! কি লেখাপড়া, কি শস্ত্র-বিদ্যায়, কি ব্যায়ামে—তাহারা অতি শীঘ্রই সুপণ্ডিত হইয়া উঠিল। তাহারা যে এত শীঘ্র সর্ব্ব বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ফেলিবে, ইহা কেহ ধারণাতেও আনিতে পারে না। আবার বড় রাজকুমার রামচন্দ্র—তিনি বয়সেও যেমন সকলের বড়, সর্ব্ব-বিদ্যায় ও পাণ্ডিত্যেও তেমনি সকলের বড় হইয়া উঠিলেন।

তাহাদের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে বাঙ্গালীর প্রথম মহাকবি কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—

পঞ্চমবর্ষ গত হয় হাতে দিল খড়ী
পড়িতে পাঠান রাজা বশিষ্ঠের বাড়ী॥

ক খ আঠার ফলা বানান প্রভৃতি
অষ্ট শব্দ পাঠ করিলেন রঘুপতি ॥
ব্যাকরণ কাব্যশাস্ত্র পড়িলেন স্মৃতি
অবশেষে পড়িলেন রাম চতুঃশ্রুতি ॥
কোন শাস্ত্র নাহি হয় তাঁর অগোচর
চৌদ্দদিনে চতুঃ ষষ্ঠি বিদ্যাতে তৎপর ॥
বিদ্যা পড়ি করিলেন গুরুকে প্রণাম
অস্ত্রবিদ্যা সেইক্ষণে শিখিলেন রাম ॥
প্রাতঃকালে চারি ভাই যান মাল্য করে
মল্লবিদ্যা শিখিল সকলে সমাদরে ॥

প্রকৃত কথা এই যে, এতদিনে রাজা দশরথের রাজ্যখানি আদর্শ রাজ্যে পরিণত হইল। ন্যায়বান্ বিচক্ষণ প্রজাপালক রাজা, কর্ম্মনিষ্ঠ সাধু মন্ত্রী, সুখী প্রজা, পণ্ডিত রাজপুত্রগণ—রাজা দশরথের যেন মনে হইতে লাগিল যে, তিনি সত্যসত্যই স্বর্গ-রাজ্যের রাজা !

রামের বিবাহ

রামচন্দ্র বাল্য হইতে কৈশোরে পড়িলেন। সর্ব্বশাস্ত্র এবং শাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী এই বালকের নয়নাভিরাম রূপ দেখিয়া রাজা, রাজকর্ম্মচারী এবং প্রজারা মুগ্ধ, এমন সময়ে তাঁহার এক ভীষণ পরীক্ষার দিন উপস্থিত হইল। একদা রাজা দশরথ সভা করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে প্রতিহারী প্রবেশ করিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিল—ঋষি বিশ্বামিত্র আসিয়াছেন, তিনি রাজ-দর্শন-প্রার্থী

রাজা শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, আন, আন—আগে আন ; সসম্ভ্রমে তাঁহাকে লইয়া আইস !

মন্ত্রীরা তথনই ঋষিকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। রাজা স্বয়ং সিংহাসন-মণ্ডপ হইতে নামিয়া আসিয়া মুনিকে প্রণাম করিলেন, পাদ্য-অর্ঘ্য দিলেন এবং আদর করিয়া উত্তম আসনে বসাইলেন।

সভাশুদ্ধ লোক তটস্থ। কেহই যেন আর সহজভাবে নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিতেছে না ; সকলে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, সকলেরই মনে হইতেছিল—যেন কি হয়, কি হয় !

সকলের ভয়ের কারণ আর কিছু নয়—ঋষি বিশ্বামিত্রের ভয়ঙ্কর তপঃশক্তি ও ভয়ঙ্কর ক্রোধের খ্যাতি। এই ঋষিটি যে সহজ লোক নহেন, সে সম্বন্ধে কিছু পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। রাজা হরিশ্চন্দ্রের অশেষ দুর্গতির মূলেও ইনিই ছিলেন। ইনি ক্ষত্রিয় নরপতি হইয়াও নিজের তপস্যার বলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। ইনি ব্রহ্মার সহিত বিবাদ করিয়া একদা স্বতন্ত্র বিশ্বসৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—এমনই ইঁহার তপোবল। ইনিই ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাইয়াছিলেন। ইঁহার তপস্যাও যেমন কঠোর ছিল, মেজাজটিও ছিল তেমনি ভীষণ, অল্পেই রাগিয়া আগুন হইতেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র অভ্যর্থনায় তুষ্ট হইয়া আসন গ্রহণ পূর্ব্বক প্রসন্ন দৃষ্টিতে সকলের দিকে চাহিলেন। তখন রাজা দশরথ পুনশ্চ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, মহর্ষি, আপনার পদার্পণে অযোধ্যাপুরী ধন্য, আমাদের কুল পবিত্র এবং স্বয়ং আমরা কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হউন এবং আদেশ করুন, আপনার কোন্ প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। সে কার্য যত দুরূহই হউক, আপনার তুষ্টির জন্য আমি তাহাই করিব।

বিশ্বামিত্র তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, মহারাজ দশরথ, আপনার বিনয়-বচনে সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনার বাক্য আপনার বংশ-গৌরবের

উপযুক্তই হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ আমি আপনার কাছে প্রার্থী হইয়াই আসিয়াছি। হে রাজন, আমি আপনার পুত্র রামকে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি কয়েক দিনের জন্ত তাহাকে আমার সঙ্গে লইয়া যাইতে দিন।

বিশ্বামিত্রের আদেশ শুনিয়া রাজা এবং সভাসদগণ সকলকারই মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। কারণ রামচন্দ্র সকলেরই নয়নের মণি শুধু নহেন, তিনি নিতান্ত বালক মাত্র—তাঁহাকে ঐ উগ্রতপা ঋষির সঙ্গে ছাড়িয়া দেওয়া কিরূপে সম্ভব হয়?

দশরথ মুহূর্ত্ত কাল ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, কিন্তু ঋষিবর, রামচন্দ্র বালক, তাহার দ্বারা আপনার কোন্ কার্য্য সাধিত হইবে?

বিশ্বামিত্র কহিলেন—মহারাজ, আপনি শুনিয়া থাকিবেন কিছুদিন যাবৎ অতি কঠিন যজ্ঞে আমরা ব্রতী আছি, কিন্তু মারীচ ও সুবাহু নামে দুইটা রাক্ষস আমাদের যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে, আমরা যজ্ঞ করিতে বসিলেই পাপিষ্ঠ দুইটা অশুচি মাংস ইত্যাদি ফেলিয়া যজ্ঞস্থল অপবিত্র করিয়া দিতেছে। আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছেন, তাঁহার তেজও আমি জানি, অমিত। মহারাজ দশরথ, আপনার বীর-পুত্র রামচন্দ্রকে আমার সঙ্গে দিন, তিনি রাক্ষস দুইটাকে বধ করিয়া আমাদের বিঘ্ন দূর করুন।

রাজা নির্ব্বাক হইয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বিশ্বামিত্র পুনশ্চ রাজার দিকে চাহিয়া কহিলেন—রামচন্দ্রের বলবীর্য্যের কথা যেরূপ শুনিয়াছি ও তপঃপ্রভাবে যাহা জানিয়াছি, তাহাতে তিনি অনায়াসেই রাক্ষস-বধ করিয়া মুনিগণের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারিবেন। আমি তাঁহাকেই লইতে আসিয়াছি।

কি সর্ব্বনাশ! রামচন্দ্রকে রাক্ষসের হাতে তিনি ছাড়িয়া দিবেন!

রাজা দশরথ আকুল হইয়া বলিলেন, কিন্তু ব্রহ্মর্ষি, রামচন্দ্র যে নিতান্ত বালক, সে কি রাক্ষসদের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে? বরং আপনি অনুমতি করুন, আমিই আপনার সহিত সসৈন্যে যাইতেছি, রাক্ষস-বধ করিয়া আপনার যজ্ঞস্থল রক্ষা করিব। আপনি অনুমতি করুন, আমিই প্রস্তুত হই।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র নিমেষ মধ্যে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; কহিলেন, মহারাজ, আমি আপনাকে চাহি নাই, রামচন্দ্রকেই চাহিয়াছি। রামচন্দ্রের দ্বারাই এই কার্য্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে। আপনিও কিছু পূর্ব্বে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, এক্ষণে যদি আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করারই অভিপ্রায় হইয়া থাকে ত তাহাই করুন, আমি চলিলাম।

এই 'যাওয়া'র অর্থ কি তাহা দশরথ ভালরকমই জানিতেন। তিনি অনেক কষ্টে তাঁহাকে শান্ত করিয়া পুনরায় বসাইলেন। কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজা দশরথকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, মহারাজ, আপনি নিশ্চিন্ত মনে রামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্রের হাতে ছাড়িয়া দিন, তাহাতে রামচন্দ্রের মঙ্গলই হইবে। কারণ বিশ্বামিত্রের তপঃশক্তিতে দেবতারা শুদ্ধ ইঁহাকে ভয় করেন, ইনি সঙ্গে থাকিতে কেহ রামচন্দ্রের অকল্যাণ করিতে সমর্থ হইবে না।

অগত্যা দশরথ রামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্রের সহিত পাঠাইতে সম্মত হইলেন। রামচন্দ্রের সহিত লক্ষ্মণও যাইতে চাহিলেন। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। তখন দুটি ভাই-ই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত যাত্রা করিলেন। সমগ্র অযোধ্যা-নগরী আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া তাঁহাদের যাত্রা-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

সরযূর তীর দিয়া বহুক্ষণ চলিবার পর তাঁহারা লোকালয় ছাড়িয়া বনে পড়িলেন।

বনে ঢুকিয়া বিশ্বামিত্র রামকে দুইটি বিদ্যা শিখাইলেন। একটি বিদ্যার নাম —বলা; ইহার প্রভাবে রামচন্দ্র ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইলেন;



তাড়কা-রাক্ষসী

রামায়ণ—পৃঃ ৪০

অপর বিদ্যাটির নাম—অতিবলা। ইহার গুণে রামচন্দ্রের দেহের শক্তি আরও বৃদ্ধি পাইল। আরও কিছুদূর গিয়া বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে কহিলেন—বৎস, *এই বনে তাড়কা-রাক্ষসী বাস করে।*

লক্ষ্মণ কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তাড়কা কে?

বিশ্বামিত্র বলিলেন—সে এক ভীষণা রাক্ষসী। তাহার নামেই সকলে ভয় পায়। মারীচ তাহারই পুত্র। ইহারা পূর্ব্বে যক্ষ ছিল—ঋষি অগস্ত্যের অভিশাপে ইহারা রাক্ষস হইয়াছে। এই বন আগে অতি সুন্দর জনপদ ছিল, কিন্তু এই রাক্ষসী তাড়কার অত্যাচারে ইহা নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। হে রামচন্দ্র, তুমি এই রাক্ষসীকে বধ করিয়া, ইহাকে আবার লোকালয়ে রূপান্তরিত কর।

রামচন্দ্র অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া ধনুকে জ্যা যোজন পূর্ব্বক টঙ্কার দিলেন। তাড়কা সেই বনেই ছিল। ধনুকের শব্দ শুনিয়া, ক্রুদ্ধা হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে আকাশ-পথে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। বহুদূর হইতেই তাহার গতির বেগে চারিদিকে ঝড় বহিতে লাগিল এবং যেন মেঘ-গর্জ্জনের মত শব্দ শোনা গেল।

বিশ্বামিত্র দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, রাম, শীঘ্র অস্ত্র নিক্ষেপ কর।

তাড়কা তাঁহাদের দেখিতে পাইয়া মায়া-প্রভাবে নিজের দেহকে দ্বিগুণ করিয়া ফেলিল এবং বড় বড় গাছ ও পাথর চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাদের উপর ফেলিতে লাগিল। কিন্তু রাম-লক্ষ্মণও সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহারা সে সব ত অনায়াসে এড়াইয়া গেলেনই, উপরন্তু বাণ ছুঁড়িয়া রাক্ষসীর হাত দুটাকে কাটিয়া ফেলিলেন। মড় মড় ধড় ধড় শব্দে তালগাছের মত হাত দু'টা মাটিতে পড়িল। লক্ষ্মণ এই সময়ে এক বাণে তাহার নাকটি কাটিয়া দিলেন।



রাম ও লক্ষ্মণ কর্তৃক তাড়কা বধ

রামায়ণ—পৃঃ ৪০

হাত গেল, নাক গেল, রাক্ষসীর বিক্রম কিন্তু তাহাতেও কমিল না—সে তখন বদন ব্যাদন করিয়া রাম-লক্ষ্মণকে গিলিতে আসিল। রাম আবার বাণ ছুঁড়িলেন—এবার আর হাত-পা নয়, একেবারে রাক্ষসীর বুকে গিয়া বাণ বিঁধিল। সঙ্গে সঙ্গে তাড়কা রক্ত-বমন করিতে করিতে আর ঘুরিতে ঘুরিতে মাটিতে পড়িয়া মরিয়া গেল।

বিশ্বামিত্র খুশী হইয়া দু'ভাইকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। দেবতারা আকাশমার্গ হইতে এই দুই বালককে আশীর্ব্বাদ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মুনিবর, ব্রহ্মাপ্রদত্ত যে-সব দিব্য অস্ত্র আপনার নিকট আছে, রামচন্দ্রই তাহা পাইবার অধিকারী। আপনি ঐগুলি রামকে দিন।

বিশ্বামিত্র দেবরাজের কথামত অস্ত্রগুলি রামচন্দ্রকে প্রদান করিলেন। বিধিমত তাহাদের প্রয়োগ-কৌশলও তিনি তাঁহাকে শিখাইয়া দিলেন। তাহার পর আরও কিছুদিন পূর্ব্বদিকে যাইবার পর অবশেষে তাঁহারা বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

সুন্দর আশ্রমটি! চমৎকার দৃশ্য! পর্ণকুটীর বটে, কিন্তু দেখিলে মনে হয়, রাজপ্রাসাদেও যেন এমন শান্তি নাই—এত শোভা নাই, এত সৌন্দর্য্য নাই! না হইবে কেন বল? মুনির তপোবন, ঋষির আশ্রম!

বিশ্বামিত্র আশ্রমে আসিতেই আরও অনেক মুনি সেখানে উপস্থিত হইলেন। রাজা দশরথের দিব্যকান্তি পুত্র দুটিকে দেখিয়া তাঁহারা আনন্দিত হইলেন। পথে এই বালক বীর দু'টিই তাড়কা বধ করিয়া আসিয়াছে শুনিয়া, তাঁহাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না, তাঁহারাও ভাই দু'টিকে বহু আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সেদিন আর কিছু হইল না। রাম-লক্ষ্মণ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তপোবন দেখিয়া বেড়াইলেন। পরদিন প্রভাতে যজ্ঞ আরম্ভ হইল।

বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে বলিয়া রাখিলেন, যজ্ঞকালে রাক্ষস দুইটা আসিবেই। আজ তাহাদের রাগ আরও বাড়িয়াছে, কারণ তোমরা দু'ভাই তাহাদের মাতৃ-হত্যা করিয়াছ! আজ তাহারা মরিয়া হইয়া আসিবে। আজ তাহারা প্রাণপণে তোমাদের অনিষ্ট-চেষ্টা করিবে।

বিশ্বামিত্র প্রমুখ মুনিগণ যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন করিয়া উপবাসী, শুচি ও সংযত হইয়া বিবিধ পূজার পর যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ হস্তে যজ্ঞস্থল রক্ষা করিতেছেন। আজ ঋষিরা নিশ্চিন্ত, তাঁহারা পরম হৃষ্ট-চিত্তে যজ্ঞে মন দিলেন।

মারীচ আর সুবাহু নামে দুই রাক্ষস। তাড়কার ছেলে তাহারা—মায়ের আকৃতি-প্রকৃতি সবই তাহারা পাইয়াছিল; অধিকন্তু তাড়কার অপেক্ষাও তাহারা দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ তাহারা ছিল দু'জন। দুজনের মিলিত শক্তি একজনের চেয়ে বেশী ত হইবেই। যেমন যজ্ঞের সুগন্ধ উঠিয়া বাতাসে ছড়াইতেছে, অমনি কোথা হইতে ঝড়ের মত, সমুদ্র-গর্জ্জনের মত শব্দ করিতে করিতে রাক্ষস দুইটা যজ্ঞস্থানে আসিয়া হাজির! দেখিতে দেখিতে যজ্ঞস্থলে খণ্ড-মাংস ও রক্তের বৃষ্টি হইতে লাগিল। রাক্ষসেরা যজ্ঞ নষ্ট করিবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। কিন্তু রামচন্দ্রও প্রস্তুত ছিলেন, উপর্য্যুপরি কতকগুলি চোখা চোখা বাণ ছাড়িলেন। এক বাণ গিয়া বিঁধিল মারীচের পৃষ্ঠে—মারীচ তাহারই আঘাতে সেখান হইতে বহুযোজন দূরে গিয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। আর একটা বাণ সুবাহুর বুকে বিঁধিতেই তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবিয়োগ হইল। তপোবনে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিল। মুনি-ঋষিরা রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাইকে কত আশীর্ব্বাদ করিলেন, কত বর দিলেন।

সকলের চেয়ে আনন্দ বিশ্বামিত্রের।

আর ভাই দুটির আনন্দও বড় অল্প নয়। যাগ-যজ্ঞ-রত মুনি-ঋষির বিঘ্ন দূর করিতে পারিয়াছেন—তাঁহাদের আনন্দই বা দেখে কে? পিতা

শুনিবেন, মাতারা শুনিবেন, রাজ্যের মন্ত্রী ও অমাত্যগণ শুনিবেন, প্রজারা শুনিবে যে—রামচন্দ্র দুর্দান্ত রাক্ষসদের বধ করিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থই আছেন।

বিশ্বামিত্র বলিলেন—রাম-লক্ষ্মণ, এখনকার কার্য্য শেষ হইল; আমি এইবার তোমাদের মিথিলায় লইয়া যাইব। জনক-রাজা সেখানে এক বৃহৎ যজ্ঞ করিতেছেন, সেখানে যাওয়া আমাদের দরকার। সেখানে আরও একটি জিনিষ তোমাদের দেখাইব, সেটী হরধনু। স্বয়ং দেবাদিদেব শঙ্কর এই ধনুটি ব্যবহার করিতেন। এক্ষণে উহা রাজর্ষি জনকের ঘরেই আছে। চল, তোমাদের উহা দেখাইয়া আনি।

রাম-লক্ষ্মণ সবিনয়ে কহিলেন—যথা আজ্ঞা দেব!

কিন্তু ঋষির যে অন্য উদ্দেশ্য ছিল, রামচন্দ্রের জীবনের মহা ঘটনার শুভযোগ ঘটানোই যে তাঁহার অভিপ্রেত, তাহা তখন তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারিলেন না।

পরদিন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণ মিথিলা যাত্রা করিলেন। মুনি-ঋষির যজ্ঞ দেখিলেন, এইবার রাজার যজ্ঞ দেখিতে পাইবেন—ভাই দু'টি খুব উৎসাহের সঙ্গেই চলিতেছেন। যাইতে যাইতে তাঁহারা একটি পুরাতন পর্ণ আশ্রম দেখিতে পাইলেন। যেন কোন দিন কোন মুনি-ঋষি এইখানে আশ্রম করিয়াছিলেন, বাস করিতেন, যাগ-যজ্ঞ করিতেন—এখন অন্য কোথাও চলিয়া গিয়াছেন, আশ্রমটিই পড়িয়া আছে।

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন—মুনিবর, ইহা কি কোন মুনির আশ্রম?

বিশ্বামিত্র কহিলেন—হ্যাঁ বৎস, এ'টি মহাত্মা গৌতমের আশ্রম ছিল।

রাম জিজ্ঞাসিলেন—গৌতম কোথা?

বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন—গৌতম এখানে নাই। এইখানেই তিনি তাঁহার স্ত্রী অহল্যার সহিত তপস্যা করিতেন। কোন কারণে অহল্যার প্রতি ক্রুদ্ধ

হইয়া তিনি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। তাহারই ফলে অহল্যা অর্দ্ধেক পাষাণে পরিণত হইয়া পড়িয়া আছেন।

রাম করুণায় আর্দ্র হইয়া কহিলেন, আহা-হা! তাঁহার উদ্ধারের কি কোন উপায় নাই?

বিশ্বামিত্র কহিলেন, আছে। অহল্যার মিনতিতে এবং দেবতাগণের অনুরোধে তিনি প্রসন্ন হইয়া উপায় বলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র যদি ঐ পাষাণে কোনদিন পদক্ষেপ করেন, তাহা হইলেই অহল্যা পুনরায় সঞ্জীবিতা হইবেন। তিনি অহল্যাকে আরও বলিয়া গিয়াছিলেন, 'আমি হিমালয়ে তপস্যার ব্রত রহিলাম, তুমি প্রাণ ফিরিয়া পাইলে সেইখানে যাইও!'...রাম, আমি সেই জন্যই তোমাকে এই আশ্রমে আনিয়াছি।

রাম কহিলেন, এখনই চলুন মহর্ষি, আমি আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছি।

রাম পাষাণ-মূর্ত্তির উপরে পা দিবা মাত্র অহল্যা শাপমুক্তা হইয়া বসিলেন। রাম তাঁহার পদধূলি লইয়া মাথায় দিলেন—অহল্যাও রামের পূজা করিলেন। বলিলেন—হে রামচন্দ্র, আমি এত দিন এক মন-প্রাণ হইয়া তোমারই তপস্যা করিতেছিলাম। কবে তুমি আসিবে, কবে তোমার নবদুর্ব্বাদলশ্যাম কান্তি দেখিতে পাইব—আমার মন-প্রাণ কেবল সেই দিনই গণিতেছিল। মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন যে, তুমি আসিবে—তোমার পদরেণুস্পর্শে আমার শাপমুক্তি হইবে। তাই আশা ধরিয়াছিলাম, নহিলে আমার মত অপরাধিনী কি দেবতার দয়া পাইত! রামচন্দ্র, তুমি দয়ার অবতার, পুণ্যের অবতার—তুমি নারায়ণের অংশে জন্মিয়াছ। তোমাকে আমি শত কোটি প্রণাম করি।

অহল্যা এই কথা বলিয়া বিবিধ যত্নসহকারে অতিথি সংকার করিলেন, তাহার পর হিমালয়ের পথে যাত্রা করিলেন।

বিশ্বামিত্রও আবার তাঁহাদের লইয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। বহুদূর চলিয়া তাঁহারা বর্তমান উত্তর-বিহারে মিথিলা-রাজ্যে উপস্থিত হইলেন।

মহাতপা বিশ্বামিত্র আসিতেছেন—অতি শীঘ্রই মিথিলায় এ-সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া গেল। রাজা রাজধানীর সীমান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন, মুনিকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য। মুনিকে সকলেই খুব আদর-অভ্যর্থনা করিয়া প্রীত করিলেন। রাজা বালক-বীর দুইটির পরিচয় জানিতে চাহিলেন। বিশ্বামিত্র বালকদ্বয়ের পরিচয় দিতে রাজা খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

এইখানে তোমাদের জনক-রাজার একটু পরিচয় দিই। জনক-রাজা নৃপতি এবং ক্ষত্রিয়-সন্তান হইলেও, জ্ঞানে এবং আচারে তপস্বীগণের মতই ছিলেন। সেই জন্য লোকে ব্রহ্মবিদ্ রাজাকে 'রাজর্ষি জনক' বলিত।

জনক-রাজা প্রায়ই যাগযজ্ঞে সময় অতিবাহিত করিতেন। সেকালে নিয়ম ছিল যজ্ঞ-স্থল যজ্ঞ-কর্তাকে নিজ-হস্তে লাঙ্গল দ্বারা চষিয়া দিতে হইত। একদা রাজা জনক পাত্রমিত্র সমভিব্যাহারে যজ্ঞস্থল কর্ষণ করিতে গিয়া এক জায়গায় বাধা পাইলেন। সামান্য চেষ্টা করিতেই বাধা অপসারিত হইল, কিন্তু দেখা গেল—তাহা ইট বা পাথর নহে, আলোকসামান্যা রূপ ও লাবণ্যবতী এক সদ্যোজাত কন্যা।

রাজা-জনক তখনও অপুত্রক ছিলেন বলিয়া পরম স্নেহে ঐ কন্যাটিকে বুকে তুলিয়া লইলেন এবং সযত্নে তাঁহাকে প্রতিপালিত করিলেন। লাঙ্গলের অগ্রভাগে বা 'সীতা'র মুখে কন্যা উত্থিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম রাখিলেন 'সীতা'।

সীতার জন্মের ইতিহাস অজ্ঞাত রহিল। কেহ বলেন, তিনি ধরিত্রীর কন্যা—তবে অধিকাংশ হিন্দুর বিশ্বাস, তিনি স্বয়ং লক্ষ্মী, রামরূপী শ্রীভগবানের সহিত বিবাহের জন্যই তাঁহার জন্ম।

রাজা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীরের হাতে এই কন্যাটিকে দান করিবেন পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ বীর কে—কি করিয়া বোঝা যাইবে? রাজা মহাদেবের নিকট হইতে একটি অদ্ভুত ধনু উপহার পাইয়াছিলেন, তেমন ধনু পৃথিবীতে আর একটিও ছিল না। রাজা শেষ পর্য্যন্ত ঘোষণা করিলেন, এই ধনুতে যিনি গুণ দিতে পারিবেন, রূপে ও গুণে অতুলনীয়া সীতাকে তিনি তাহারই সহিত বিবাহ দিবেন।

রাজার এই পণ শুনিয়া যেখানে যত বীর ছিলেন—সব সীতা-লাভের আশায় মিথিলায় ছুটিয়া আসিলেন। একটা ধনু বৈ ত নয়—তাহাতে গুণ দেওয়া ত বড়ই কাজ, তাহার আবার ভয়টা কি! সব হুড় হুড় করিয়া আসিলেন, কিন্তু শেষে ম্লান মুখে পালাইলেন। কারণ ধনুকে কেহ গুণ দিতে ত পারিলেনই না, সেটিকে যে একটু নড়াইয়া-চড়াইয়া তাহার নির্ম্মাণ-কৌশলটাও অন্ততঃ দেখিয়া লইবেন, তাহা পর্য্যন্ত কাহারও সাধ্যে কুলাইল না।

বিশ্বামিত্র রাজাকে ধনুটি একবার আনাইয়া রামকে দেখাইতে বলিলেন।

মুনির আদেশে ধনু আসিল। বহুলোক অনেক কষ্টে বহিয়া আনিল।

বিশ্বামিত্র রামকে সেই ধনুতে গুণ দিতে বলিলেন। রাম তখনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাম হাতে ধনু ধরিয়া, গুণ পরাইয়া দিলেন এক টান! আর দেখিতে দেখিতে মড় মড় শব্দ করিয়া সেই বিশাল ধনুক দুই খণ্ড হইয়া গেল।

চারিদিকে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল। যে কাজ পৃথিবীর বড় বড় বীরেরা করিতে পারেন নাই, বালক হইয়াও রামচন্দ্র তাহাই করিলেন। বীর বটে!

জনক-রাজা তখনি সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

রামচন্দ্র আমার পণ রক্ষা করিয়াছেন, হর-ধনু ভঙ্গ করিয়াছেন। আমি তাঁহার হাতে আমার আদরের সীতাকে অর্পণ করিব।

সকলেই তাহাতে মত দিলেন। রাজবাড়ীতে মহোল্লাস চলিতে লাগিল।

জনক-রাজা তখনি ভাবী-বৈবাহিক অযোধ্যাপতি দশরথের নিকট সবিশেষ বৃত্তান্ত দূত-মুখে বলিয়া পাঠাইলেন; যাহাতে মহারাজ দশরথ সংবাদ পাইবামাত্র সবান্ধবে মিথিলায় আসিয়া শুভ-বিবাহ-কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া যান, সে-অনুরোধও করিয়া পাঠাইলেন।

দূত অযোধ্যায় চলিয়া গেল।

অযোধ্যায় আসিয়া মিথিলার রাজ-দূত দশরথের নিকট সকল কথা কহিল। তাড়কা-বধের কথা, তাড়কার পুত্রদ্বয় বধের কথা, অহল্যা উদ্ধারের কথা ও হরধনু-ভঙ্গের কথা—সবই বলিল। শুনিয়া রাজা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। এমন বীর-পুত্রের জনক বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট গর্ব্বও হইল।

রাণীরাও সব শুনিলেন; তাঁহারা রামের মা—তাঁহাদের আনন্দ-গর্ব্বও ত বড় অল্প নয়। তাঁহারা দূতের মুখে খুঁটি-নাটি সকল কথা শুনিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

মিথিলার রাজদূত রামের সহিত সীতার বিবাহের কথাও বলিল।

রাজা ও রাণীরা তৎক্ষণাৎ সে-প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। রাজা স্বয়ং অন্য দুই পুত্রকে লইয়া, হাতী, ঘোড়া, রথ সাজাইয়া, লোক-লস্কর লইয়া, বাজনা বাজাইয়া মিথিলার দিকে অগ্রসর হইলেন। রাণীরা বলিয়া দিলেন, এক সঙ্গে যদি চারটি ছেলেরই বৌ ঘরে আসে, তবেই ভাল হয়; সেই চেষ্টাই করিও। রাজা হাসিমুখে, চেষ্টা করিবেন বলিয়া রথে উঠিলেন।

জনক-রাজা অযোধ্যাপতির যোগ্য সম্মান দেখাইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা

করিয়া লইলেন। পিতা আসিয়াছেন, ভরত-শত্রুঘ্ন আসিয়াছে—রাম-লক্ষ্মণ পিতাকে প্রণাম করিলেন, ভাইদের আলিঙ্গন করিলেন।

দশরথ সীতাকে দেখিতে চাহিলেন।

জনকরাজা বেত্রধারিণীকে হুকুম দিলেন—অন্তঃপুর হইতে অশেষ শোভাময়ী সীতাকে আনা হইল। সীতা আসিলেন—তাঁহার পিছন পিছন আরও তিনটি সুন্দরী কন্যা আসিলেন।

জনক সীতাকে দেখাইয়া বলিলেন—এই আমার বড় মেয়ে সীতা!

তারপর আর একটি মেয়েকে দেখাইয়া বলিলেন—এটি আমার ছোট মেয়ে উর্ম্মিলা। আর এই যে দুটি মেয়ে দেখিতেছেন, ইহারা আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী—মাণ্ডবী আর শ্রুতকীর্ত্তি!

অযোধ্যা হইতে আসিবার কালে রাণীরা যে কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, দশরথের তাহা মনে ছিল; সহাস্য মুখে বলিলেন—আপনার বাড়ীতে চারিটি মেয়ে আছে, আমারও চারিটি ছেলে—সবগুলির একসঙ্গে বিবাহ হইয়া গেলে মন্দ হয় না।

বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ প্রভৃতি সকলেই এ-প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

জনক বলিলেন—আমারও সেই অভিলাষ। সেই জন্যই আমি সীতার সঙ্গে ইহাদেরও এখানে উপস্থিত করিয়াছি।

শুভদিন দেখা হইল; দেশে-দেশে নিমন্ত্রণ গেল। খুব ধূমধাম পড়িয়া গেল—একদিনে জনকরাজার বাড়ীতে চারি কন্যার বিবাহ মহাপ্রতাপশালী অযোধ্যা-রাজ দশরথের চারিপুত্রের সঙ্গে—ধূমধাম আবার হইবে না? উৎসবের যেন বান ডাকিল।

যথা সময়ে বিবাহ হইয়া গেল। সীতার সঙ্গে রামের; মাণ্ডবীর সঙ্গে ভরতের; শ্রুতকীর্ত্তির সঙ্গে শত্রুঘ্নের; আর উর্ম্মিলার সঙ্গে লক্ষ্মণের। জনক-রাজা এত ধন-রত্ন, মণি-মুক্তা, হাতী-ঘোড়া, দাস-দাসী যৌতুক দিলেন

যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সে সব জিনিষপত্র লইয়া যাইতে এত গাড়ী আর হাতী লাগিল যে তাহা গণিতে গেলে একটা পুরা দিন লাগিয়া যাইত!

গরীব-দুঃখী খাদ্য পাইল। দেশময় জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল।

রাজা দশরথ ছেলেদের ও পুত্রবধূদের লইয়া অযোধ্যা যাত্রা করিলেন। জনক-রাজা কিছুদূর পর্য্যন্ত আসিয়া আনন্দাশ্রুতে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে কন্যা-জামাতার নিকট বিদায় লইয়া মিথিলায় ফিরিয়া গেলেন। শোভাযাত্রা অযোধ্যার দিকে চলিতে লাগিল।

পরশুরাম

শোভাযাত্রা নিরাপদে বহুদূর চলিবার পর সহসা এক আকস্মিক বাধা পাইল। চারিদিকে তুমুল কোলাহল ও আর্ত্তনাদের মধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল, রুদ্রসদৃশ তেজস্বী এক বিরাটকায় তপস্বী অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া কুঠার ও ধনুক লইয়া ছুটিয়া আসিতেছেন। তাঁহার ভয়ে বনের পশুপক্ষী পর্য্যন্ত পলায়ন করিতেছে—সূর্য্যের আলো পর্য্যন্ত ভয়ে ম্লান দেখাইতেছে। সৈন্যেরা তাঁহার দৃষ্টিতেই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

কে এই তেজস্বী ঋষি? ঋষি অথচ ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বী? ইনি স্বয়ং পরশুরাম!

ব্রহ্মার মানসপুত্র মহর্ষি ভৃগুর বংশে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার অপর নাম ছিল ভার্গব। ইঁহার পিতা মহর্ষি জমদগ্নির সহিত ক্ষত্রিয়-রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের একবার বিবাদ হয়, তাহাতে জমদগ্নি ঐ রাজার হাতেই নিহত হন। সেই রাগে, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার বাসনায় তাঁহার বিপুল পরশু বা কুঠার হস্তে তিনি সমস্ত ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। একুশবার তিনি এমন ভাবে ক্ষত্রিয়দের বধ

করেন যে, লোকে বলে যে তিনি একুশবারই ধরণীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন।

এহেন পরশুরামকে ভীষণ-মূর্ত্তিতে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া দশরথ সভয়ে তাঁহার সম্মুখে গিয়া প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইলেন, বলিলেন, প্রভু, কোন্ প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইবে ?

কিন্তু পরশুরামের দৃষ্টি সেদিকে ছিল না ; তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, তুমিই রাম ? হরধনু ভঙ্গ করিয়াছ ?

রাম কহিলেন, হাঁ প্রভু, আমিই সেই রাম !

পরশুরাম দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, তুমি শিবের ধনুক ভাঙ্গ, তোমার এত স্পর্দ্ধা ? বেশ, আমার হাতে এই যে ধনুকটি দেখিতেছ, এটিও হরধনুর তুল্য কঠোর—একই কারিগর বিশ্বকর্ম্মার তৈয়ারী। পরাও দেখি এই ধনুকে গুণ ! কত বড় তোমার শক্তি তাহাই দেখি।

রামচন্দ্র মধুর হাস্য করিয়া অনায়াসে ধনুকটি তাঁহার হাত হইতে লইলেন। তাহার পর তাহাতে অবলীলাক্রমে গুণ পরাইয়া কহিলেন, আপনি একুশবার ক্ষত্রিয়-বধ করিয়া ভাবিয়াছেন, সমস্ত ক্ষত্রিয়ই নিবীর্য্য। তাই আপনার এত অহঙ্কার ! আপনার অহঙ্কারের শাস্তি আমিই দিব। আপনার ধনুকে আমি এই অস্ত্রযোজনা করিব—হয় এই অস্ত্রে আপনার দেবলোক-গমনের পথ রুদ্ধ করিয়া দিব, নচেৎ আপনার চলৎশক্তি নষ্ট করিব। বলুন, আপনি কোন্‌টা চান ?

পরশুরাম রামের বলবীর্য্য দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া কহিলেন, বুঝিলাম তুমি সত্যই বীর। আমার চলৎশক্তি লোপ করিও না, বরং তপোবলে যথেচ্ছ দেবলোকে যাইবার যে ক্ষমতা আমার আছে, তাহাই নষ্ট করিয়া দাও। তোমার কল্যাণ হউ।

পরশুরাম হৃষ্টচিত্তে তপস্যায় চলিয়া গেলেন। দশরথও অতঃপর

নির্ব্বিঘ্নে এবং নিরাপদে অযোধ্যায় আসিয়া পৌঁছিলেন। ঘরে ঘরে আনন্দের রোল উঠিল, সমস্ত পুরী কিছুদিন ধরিয়া নিরবচ্ছিন্ন উৎসবে ডুবিয়া রহিল।

শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন,
বন্দিলেন গিয়া ঘরে মায়ের চরণ॥
চারিপুত্রে আশীর্ব্বাদ করে রাণীগণ।
চিরজীবী হও পাও বহু পুত্র ধন॥
চারিপুত্র লয়ে রাজা সুখী বহুতর।
সুখে রাজ্য করে যেন স্বর্গে পুরন্দর॥



অযোধ্যাকাণ্ড

কিছুকাল খুব সুখে-স্বচ্ছন্দে এবং অখণ্ড শান্তিতে কাটিল। রামচন্দ্র ইতিমধ্যে আরও বড় হইয়াছেন। রাজ্যচালনার জন্য যত কিছু গুণ থাকা দরকার, তাহা সমস্তই তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছে।

এদিকে রাজাও বুড়া হইয়াছেন। সুতরাং তিনি একদিন বড় ছেলে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, তাঁহার হাতে রাজ্যের কতকটা ভার তুলিয়া দিবেন—সভায় বসিয়া এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি উপস্থিত সকলের মতও চাহিলেন। রামচন্দ্রকে সকলেই ভালবাসিতেন। তাঁহার চরিত্রগুণে প্রজা হইতে শুরু করিয়া সভাসদেরা সকলেই মুগ্ধ। সুতরাং কথাটা শোনামাত্র সভায় হর্ষের রোল উঠিল। রামের মত বীর, উদার, ন্যায়বান ছেলে যুবরাজ হইবেন, এ তো পরম আনন্দেরই কথা। রাজাসুদ্ধ লোক বলিল—এখুনি, এখুনি!

পুরোহিত তখনই শুভদিন স্থির করিলেন; উদ্যোগ-আয়োজন চলিতে লাগিল; নিমন্ত্রণ লইয়া চতুর্দ্দিকে দূত ছুটিল; রাজধানীতে সমারোহ পড়িয়া গেল।

রামকে যেমন সবাই ভালবাসিত, সীতাকেও তেমনি সবাই ভালবাসিত। রাম এখন যুবরাজ হইতেছেন, পরে ত তিনিই রাজা হইবেন, তখন সীতা হইবেন রাণী—অন্তঃপুরের সকলেই তাই সীতাকে এখন হইতেই রাণীর চোখে দেখে, শ্রদ্ধা-ভক্তি করে; সীতাও বড়কে বড়র মত মান্য করেন, ছোটদের আদর-যত্ন করেন। অন্তঃপুরেও—রাম যুবরাজ হইতেছেন, এ-সংবাদে সকলেই আনন্দে মাতিয়াছে।

কেবল একটি লোক ছাড়া!

সে লোকটি মেজরাণী কৈকেয়ীর একটা কুঁজী দাসী, নাম মন্থরা। মন্থরার বাহিরটা দেখিতে যেমন কদাকার ছিল, তাহার ভিতরটাও ছিল তেমনি বিশ্রী। রাম যুবরাজ হইবেন—পরে রাজা হইবেন, এটা তা'র কাছে আদৌ ভাল লাগিল না। সে চাহিত, মেজরাণীর ছেলে ভরতই রাজ্য পান। কারণ কুঁজী ভরতকে মানুষ করিয়াছিল, তাঁহাকে ভালবাসিত; যাহাতে ভরত-রাজা হয়, তাঁহার ভাল হয়, সে তাহাই চাহিত। তাই সে খবরটা শুনিয়া মুখখানা গম্ভীর করিয়া রাণী কৈকেয়ীর মহলে গিয়া উপস্থিত হইল। রাণী কৈকেয়ী তখন বিশ্রাম করিতেছিলেন। মন্থরা তাঁহার মহলে প্রবেশ করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, তুমি ত বেশ আরামে শুইয়া আছ, ওদিকে তোমার কি সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, তাহার খবর রাখ কি?

সভয়ে উঠিয়া বসিয়া কৈকেয়ী প্রশ্ন করিলেন, না, কি খবর?

মন্থরা কহিল, রাজা নাকি আজ সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। অতঃপর এখন হইতে রামই রাজকার্য্য দেখিবে।

কৈকেয়ী হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন, আহা, কি আনন্দে কথা! মন্থরা, তুই যে সংবাদ শুনাইলি, তাহার উপযুক্ত পুরস্কার আর কি দিব? এই নে, আমার কণ্ঠের মণিহার গ্রহণ কর—

এই বলিয়া কৈকেয়ী তাহার গলা হইতে বহুমূল্য রত্নহার খুলিয়া মন্থরাকে দিতে গেলেন। মন্থরা বিরক্ত হইয়া হারটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল,ইহাকেই বলে নির্ব্বোধ! তোমার যে সর্ব্বনাশ হইতে চলিল, তাহার খবর রাখ?

কৈকেয়ী বিস্মিত হইয়া কহিলেন, রাম রাজা হইলে আমার সর্ব্বনাশটা হইল কিরূপে? রাম আমার বড় ছেলে, আমার নিজের পুত্রের অপেক্ষাও প্রিয়। সে আমাকে কত ভক্তি-শ্রদ্ধা করে! তাহা ছাড়া সেই ত জ্যেষ্ঠ পুত্র—রাজ্যে ত তাহারই অধিকার!



এই নে, আমার কণ্ঠের মণিহার গ্রহণ কর—

রামায়ণ—পৃঃ৫৪

মন্থরা হাজার হউক দাসী! তা' সে চিরকাল যে সমাজে বড় হইয়াছে, দিন কাটাইয়াছে, তাহাতে এ-উদারতার স্থান নাই। সে নিজের মতই পৃথিবীকে জানে। সে কহিল, ভক্তি-শ্রদ্ধা যাহা কিছু সব এখন দেখিতেছ। রাজা হইলে আর সে তোমাকে চিনিতে পারিবে না। তাহা ছাড়া ভরতেরই কি দুর্দ্দশা কম হইবে! লক্ষ্মণ রামের প্রিয়, তাহারই সম্মান বাড়িবে—ভরতকে হয়ত প্রাণে রক্ষা করাই কঠিন হইবে।

কৈকেয়ীর মুখ এতক্ষণে শুকাইয়া উঠিল; তিনি তবুও কহিলেন, না, না, সে কখনও হইতে পারে?

মন্থরা হাত-পা নাড়িয়া কহিল, তুমি ত সব খবরই রাখ কিনা! রাম ভরতকে একটুকুও ভালবাসে না; এক্ষেত্রে তাহাকে মারিয়া ফেলিলেই রামের সুবিধা—তাহা ভুলিয়া যাও কেন? সংসারে এমনিই হয়!

এইভাবে মন্থরা বহুক্ষণ ধরিয়া বুঝাইবার পর কৈকেয়ীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, রাম রাজা হইলে ভরতের বিপদের আর অবধি থাকিবে না। তিনি শুষ্ক মুখে প্রশ্ন করিলেন, মন্থরা, তাহা হইলে এখন উপায়?

মন্থরা খুশী হইয়া কহিল, এই ত কথার মত কথা! উপায়ের অভাব কি? উপায় আমি এখনই ঠিক করিয়া দিতেছি। রাজা দশরথ এক সময় দুটি বর দিতে চাহিয়াছিলেন—মনে আছে? তুমি বলিয়াছিলে, পরে চাহিয়া লইবে।

প্রকৃতপক্ষে কৈকেয়ী কথাটা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। বহুদিন আগে··· কৈকেয়ী তখন নব-পরিণীতা বধূ···রাজা দশরথ দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া অসুরদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও রাজা ভীষণ ভাবে আহত হন। সেই সময় রাণী কৈকেয়ী দিনরাত্রি অক্লান্তভাবে স্বামীর সেবা করেন। সে সময়ে রাজার প্রাণের আশা ছিল না বলিলেই হয়—একরকম কৈকেয়ীর সেবার জোরেই তিনি প্রাণ ফিরিয়া পান। শুধু

তাহাই নয়, বিষাক্ত ক্ষত-মুখ হইতে কৈকেয়ী নিজে মুখ দিয়া রক্ত-পূঁজ টানিয়া লন। তাঁহার সেই সেবায় তুষ্ট হইয়া রাজা বলেন, কৈকেয়ী, তুমি ইচ্ছা মত দুইটি বর প্রার্থনা কর—তুমি যাহা চাহিবে তাহাই দিব!

কৈকেয়া কহিলেন, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর কোন সুখই নাই। সেই স্বামীর সেবা করিয়াছি, তাহার আবার কি পুরস্কার লইব? আমার বরে প্রয়োজন নাই।

কিন্তু দশরথ বর লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন মন্থরারই পরামর্শ-মত কৈকেয়ী বলিলেন, এখন থাক—যখন ইচ্ছা হইবে বর চাহিয়া লইব!

রাজা দশরথ বলিলেন, তথাস্তু! তুমি যদি ইন্দ্রের সিংহাসনও কামনা কর কোনদিন, নিজের বাহুবলে তাহাই জয় করিয়া আনিয়া তোমায় দিব।

বিদ্যুৎ বেগে কথাটা কৈকেয়ীর স্মৃতি-পথে আসিল; তিনি কহিলেন, ঠিক ত! তা কি বর চাহিব?

মন্থরা কহিল, এক বর চাহিবে—রাম যাহাতে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে যায়, আর এক বরে প্রার্থনা করিবে—ভরতের জন্য সিংহাসন। তাহা হইলেই অভীষ্ট সিদ্ধি। ভরত চৌদ্দ বৎসর রাজত্ব করিলে, আর তখন রাম সিংহাসন কাড়িয়া লইতে পারিবে না। প্রজা ও মন্ত্রিগণ সকলেই ভরতের বশীভূত হইয়া পড়িবে।

শিহরিয়া উঠিয়া কৈকেয়ী কহিলেন, এই বর যদি মহারাজা না দিতে চান?

মন্থরা খলের হাসি হাসিয়া কহিল, মহারাজা তোমাকে যেরূপ ভালবাসেন, তাহাতে তুমি রাগ করিলেই আর না দিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি যদি না দিতে চান ত মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকিও কিম্বা কাঁদিও, তাহা হইলেই

সম্মত হইবেন। আর তাহা ছাড়া বৃদ্ধ বয়সে রাজা যে সহজে সত্যভ্রষ্ট হইবেন, এরূপ আশঙ্কা করিও না।

কাল রামের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবার দিন। রাজধানীতে খুব সমারোহ চলিতেছে…রাজবাড়ীতে ত কথাই নাই। রাজা বাহিরের কাজ সারিয়া অন্তঃপুরে আসিয়া বড় রাণীর সঙ্গে দেখা করিলেন। তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, মেজরাণীর মহলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সর্ব্বনাশ! কৈকেয়ী মাটিতে পড়িয়া আছেন; গায়ের মণি-মুক্তার অলঙ্কার সব ধূলায় লুটাইতেছে; কনক-পালঙ্কখানি একপাশে পড়িয়া যেন কাঁদিতেছে।

এ কি! এ-আনন্দের দিনে এ কি কাণ্ড! রাজা কৈকেয়ীকে ডাকিলেন, কাছে বসিয়া কত আদর-আপ্যায়ন করিলেন, রাণী মুখ তুলিলেন না। রাজার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। এমন শুভ দিনে চোখে জল দেখিলে কার না প্রাণে বাজে? রাজা কাতর-স্বরে বলিলেন—কৈকেয়ী, তোমার কি হইয়াছে? আমাকে বল, আমি যেরূপে পারি তোমাকে সন্তুষ্ট করিব। কেহ কি তোমার অসম্মান করিয়াছে? বল, কাহার ব্যবহারে তুমি কষ্ট পাইয়াছ? বল, কে তোমার ঐ পদ্মের মত চক্ষু দুটিতে জল বহাইয়াছে? বল! আমি এখনই তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিব। বল।

তবু রাণীর মুখে কথা সরিল না।

রাজা আবার বলিলেন—বল রাণী, কে তোমার মনোবেদনার কারণ হইয়াছে? আমি এই দণ্ডে দণ্ডবিধান করিব। বল সে কে?

রাণী বলিলেন—মহারাজ, সে-কথা বলিয়া কোন লাভ নাই; আপনি তাহার প্রতিকার করিতে পারিবেন না।

সে কি রাণী? আমি অন্যায়ের প্রতিকার করিব না, এও কি একটা

কথা! ভাল, বিশ্বাস না হয়, দেখ, করি কি-না! বল, বল কে সে অত্যাচারী?

কৈকেয়ী এবার নিম্নস্বরে বলিলেন—মহারাজ, আমার মনোবেদনার কারণ আপনি স্বয়ং!

আমি! সে কি রাণী? আমি কি করিয়াছি?

রাজা! একবার অসুর যুদ্ধে আপনি ভীষণ আহত হইয়া আসেন—আপনার কি সে কথা মনে আছে?

আছে বৈ কি রাণী!

তবে নিশ্চয়ই ইহাও মনে আছে যে একজন প্রাণপণ করিয়া আপনার সেবা করিয়াছিল। আপনার মনে আছে কি?

আছে বৈ-কি রাণী! সে একজন—তুমিই! তোমায় আমি দুইটি বর দিতে চাহিয়াছিলাম—তাহাও আমার মনে আছে কৈকেয়ী!

রাণী বলিলেন—আমি তখন বর লই নাই, কারণ আমি জানিতাম, রাজার জীবন ফিরাইয়া দিতে পারিয়াছি যখন, তখন রাজা ও রাজ্য আমারই!

রাজা সরল বিশ্বাসে কহিলেন—ও দুটাই ত তোমার, রাণী!

রাণী কহিলেন—দুটাই যদি আমার, তবে আমার বিনানুমতিতে রাজ্যের ব্যবস্থা করেন কিরূপে?

দশরথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—তুমি কি করিতে চাও, রাণী?

রাণী বলিলেন—আমি চাই, ভরত রাজা হোক। আর রাম—সে-দৃশ্য যখন দেখিতে পারিবে না, তখন তাহার কাছে না থাকাই ভাল—সে চৌদ্দ বৎসর বনবাস করুক।

দশরথ এ-কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; ভাবিলেন—কৈকেয়ী রহস্য করিতেছেন। হাসিয়া বলিলেন—তুমি ঠাট্টা করিতেছ!

কৈকেয়ী আবার ধূলায় লুটাইলেন, কাঁদিলেন, বলিলেন—মহারাজ, আপনার নিকট আমার দুইটি বর প্রাপ্য আছে। আপনি সত্যবাদী রাজা… প্রতিশ্রুত আছেন…আমি বর চাহিয়াছি! ইচ্ছা হয় দিন, না হয় প্রতিশ্রুতি ফিরাইয়া দিতেছি…কিন্তু রহস্য নয়, ইহাই আমি চাই!

ইহাই তুমি চাও? রাজা কথা বলিতে পারিলেন না; রাজা শ্বেত-পাথরের মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িলেন। রাজা জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া কত কাঁদিলেন, কত বিলাপ করিলেন—কৈকেয়ীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, এমন কি কৈকেয়ীর পায়ে পর্যান্ত ধরিলেন, তবু কৈকেয়ী অটল! তাঁহার সেই এক কথা, ভরত রাজা হইবে এবং রাম বনে যাইবে!

রাজা আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই অবসরে কৈকেয়ী রামচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাম কৈকেয়ী-মাতার মহলে আসিয়া পিতাকে তদবস্থায় দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিলেন, জননী, পিতার এ-অবস্থা কেন?

কৈকেয়ী গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, পিতার এ-অবস্থার কারণ তুমি।

বিস্মিত রাম প্রশ্ন করিলেন, আমি! সে কি?

কৈকেয়ী কহিলেন, রাজা বহুদিন আগে আমাকে দুইটী বর দিবেন বলিয়া সত্যবদ্ধ ছিলেন। সেই বর দুইটি আমি আজ চাহিয়াছি। তুমি চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে যাও এবং ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হউক—এই আমার ইচ্ছা। রাজা তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ এ-আদেশ দিতে পারিতেছেন না, অথচ না দিলেও সত্যভ্রষ্ট হইবেন। এই উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়া তিনি এতাদৃশ কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার এই দুরবস্থার কারণ সবই শুনিলে, এখন তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার!

রাম কিছুক্ষণ অবনত মস্তকে থাকিবার পর ধীরে ধীরে কহিলেন, আর্য্যা, আমার জীবন থাকিতে পিতা সত্যভ্রষ্ট হইবেন না।

সংবাদটা তখনই প্রাসাদময় ছড়াইয়া পড়িল। কৌশল্যা, সুমিত্রা, লক্ষ্মণ, বধূগণ ও অন্যান্য রাজপুরবাসিগণ. সকলেই হাহাকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিলেন। রাম সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন—কেহ রাণী কৈকেয়ীর প্রতি অন্যায় করিবেন না; তিনি আমার মা। তিনি যাহা করিতেছেন, আমি বেশ বুঝিতেছি তাহা আমার ভালর জন্যই করিতেছেন। আমি হাসি-মুখে ভাই ভরতকে রাজ্য ও সিংহাসন দিয়া বনে যাইতেছি। আপনারা সকলে শান্ত হোন্।

কিন্তু শান্ত হওয়া যায় কি? সকলে কপালে করাঘাত করেন, আর কাঁদেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, দাদা, আমি আজ তোমার অবাধ্য হইব। এ অবিচার আমি কিছুতেই সহিব না।

রাম ভাইকে বুকে চাপিয়া বলিলেন—লক্ষ্মণ, পিতার সত্য পুত্রকে রাখিতে হইবে। পুত্রের জন্য পিতা অসত্যবাদী হইবেন—ইহা পুত্রের ধর্ম নহে।

লক্ষ্মণ নিরস্ত হইলেন; বলিলেন—বেশ, তুমি যদি বনে যাও, আমাকে লইয়া চল।

তুমি যে ভাই ছেলেমানুষ!

তা হোক, আমি যাইব।

সীতা বলিলেন—আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।

পুরনারীরা এই কথা শুনিয়া আর একবার হাহাকার করিয়া উঠিলেন। অযোধ্যার রাজবধূ বনে যাইবেন? স্বয়ং সূর্য্যও যাঁহাদের দেখিতে পান না, তিনিই কি না আজ পথচারী হইবেন!

কিন্তু সীতা অটল! তিনি সবিনয়ে কহিলেন, আপনারাই বলিয়াছেন, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের অন্য গতি নাই। একণে অনুমতি করুন, আমি স্বামীরই অনুগমন করি।

তখন তাঁহারা পিতার চরণ বন্দনা করিলেন…মায়েদের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় রাখিলেন…রাজপুত্রের পোষাক ছাড়িলেন…চীর ধারণ করিলেন। রামের আদেশে সুমন্ত্র রথ আনিয়া রাখিয়াছিল। দৃঢ় পদে রামচন্দ্র পিতৃ-সত্য-রক্ষার্থে অযোধ্যা-রাজ্য, রাজপ্রাসাদ, জনক-জননী পরিত্যাগ করিয়া বন-গমন করিলেন। লক্ষ্মণ ও সীতা ছায়ার মত রথে উঠিলেন।

রাম যখন বনে গেলেন, তখনও দশরথ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন। ক্ষণেকের জন্য তাঁহার জ্ঞান হইতেই শুনিলেন, রাম বনে গিয়াছেন এবং সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁহাদের অনুগামী হইয়াছেন। তিনি বক্ষে করাঘাত ও বিলাপ করিতে করিতে আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন—সে-মূর্চ্ছা আর তাঁহার ভাঙ্গিল না। তিনি চারিদিন পরেই মারা গেলেন।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিবে যে, রাজা দশরথের মত সত্যনিষ্ঠ এবং পুণ্যাত্মা রাজার এ-অবস্থায় মৃত্যু ঘটিল কেন? তাহার উত্তরে রাজা দশরথের প্রথম জীবনের একটি গল্প শুনাইব। তখনও রামচন্দ্র জন্মান নাই—তখনও রাজা দশরথ অপুত্রক।

এই অবস্থায় একদিন জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে রাজা মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন। নদীর তীরে রাত্রে হরিণরা জল খাইতে আসে। তাহাদেরই প্রতীক্ষায় দশরথ একেবারে জলের ধারে গোপনে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ জল-পানের শব্দ শুনিয়া, সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছাড়িলেন শব্দভেদী বাণ। তাঁহার অব্যর্থ সন্ধান! তখন আর্তনাদ শোনা গেল, কিন্তু তাহা হরিণের নহে—মানুষের।

রাজা দশরথ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন যে, এক ঋষি-তনয় কলসীতে জল ভরিতে আসিয়াছিলেন। তাহারই শব্দ শুনিয়া তিনি হরিণ মনে করিয়াছিলেন—তীর বিঁধিয়াছে সেই ঋষি-কুমারের বুকে।

রাজা ব্যাকুল হইয়া তাঁহার পায়ে পড়িলেন; বলিলেন, অজ্ঞাতে ভুল করিয়াছি, মার্জ্জনা করুন!

ঋষি-কুমার তখন রক্ত-বমন করিতেছেন; অতি কষ্টে বলিলেন, আমি অন্ধমুনি সিন্ধুর পুত্র। অন্ধ জনক-জননী তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন—তুমি এই জল পৌছাইয়া দিও। আমি তোমাকে মাপ করিলাম।

ঋষি-কুমারের মৃত্যু হইল। রাজা দশরথ ভীত-পদক্ষেপে ঋষির আশ্রমে গিয়া পৌছিলেন। ঋষি পদশব্দ শুনিয়া সাগ্রহে ছেলের নাম ধরিয়া ডাকিলেন। রাজা তাহার কি জবাব দিবেন? রাজা নিরুত্তর। সাড়া না পাইয়াই মুনির সন্দেহ হইল। তিনি তখন কহিলেন, কে তুমি? যদি ঋষিকোপে পড়িবার ইচ্ছা না থাকে ত শীঘ্র উত্তর দাও।

রাজা তখন অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সব কথা বলিয়া ঋষির কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। ঋষি ও তাঁহার পত্নী হাহাকার করিয়া উঠিলেন। তাহার পর কহিলেন, আমাদের কোন মতে হাত ধরিয়া সেইখানে লইয়া চল। অমন পুত্র হারাইয়া আমাদের বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। তবে মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার তাহার দেহকে বুকে চাপিয়া ধরিতে চাই।

দশরথ ঋষি-পত্নীর হাত ধরিয়া নদী-তীরে লইয়া গেলেন। সেখানে পুত্রের দেহ বুকে করিয়া ঋষি অভিশাপ-বাক্য উচ্চারণ করিলেন, আমার যেমন পুত্রশোকে মৃত্যু হইল, আমার পুত্রের হত্যাকারীকেও তেমনি পুত্রশোকে মরিতে হইবে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, রাজা দশরথ এই অভিশাপ শুনিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। কারণ অপুত্রক বলিয়া তাঁহার দুঃখ ছিল। ঋষি-বাক্য ত মিথ্যা হইবার নয়। ঋষি যখন পুত্রশোকে মৃত্যু হইবে বলিয়াছেন, তখন অন্ততঃ পুত্র ত তাঁহার হইবে!

দশরথ সেই কথাই ঋষিকে জানাইলেন। অল্পক্ষণ পরেই মুনির মৃত্যু হইল। সেই অভিশাপ এতদিন পরে এইভাবে সফল হইল।

এদিকে রাণী কৈকেয়ীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। মন্থরার কুপরামর্শে তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় রামচন্দ্রকে বনে পাঠাইয়া, অযোধ্যার সকলের ঘৃণার পাত্রী হইলেন···স্বামীর মৃত্যুর কারণ হইলেন—আবার যাহার জন্য এত কাণ্ড, সেই পুত্রকে তিনি বশে আনিতে পারিলেন না। রাম যখন বনে যান, ভরত আর শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় ছিলেন না—মাতুলালয়ে ছিলেন। রাজার মৃত্যু সংবাদ পাইবামাত্র অযোধ্যায় আসিয়া, এই সব কাণ্ড দেখিয়া ভরত ত একেবারে দিশেহারা হইয়া গেলেন। মার সম্মুখে যাইতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। শত্রুঘ্ন সর্ব্ব অনিষ্টের মূল মন্থরাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন আর একটি দিনও নষ্ট না করিয়া, যে দিকে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা গিয়াছেন, সেই দিকে চলিলেন। যাইবার কালে বলিয়া গেলেন, রামকে ফিরাইয়া আনিতে পারি ভালই, নহিলে অযোধ্যা রাজ্য, সরযূ, জননী, পুরবাসিগণ—তোমাদের কাছে এই শেষ বিদায় লইয়া চলিলাম। আমি পৃথিবী-রাজ্য পাইলেও আমার ভাইকে ছাড়িতে পারিব না, অযোধ্যা ত অতি তুচ্ছ! রাণী কৌশল্যা সাশ্রুনেত্রে ভরতকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন।

ভরত ও শত্রুঘ্ন রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বনে গমন করিলেন। সারথি সুমন্ত্র যে জঙ্গলের ধারে তাঁহাদের রাখিয়া আসিয়াছিল, সেইখানেই আবার রথ চালাইয়া উপস্থিত হইল। ভরত ও শত্রুঘ্ন সেখান হইতে হাঁটিয়া চলিলেন।

বহুদূর চলিয়া তাঁহারা চিত্রকূটে পৌঁছিলেন।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা তখন এই চিত্রকূট পর্ব্বতেই অবস্থান করিতেছিলেন।

পথে দিন-কয়েক চণ্ডালরাজ গুহকের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের নিকট ভরদ্বাজ-আশ্রমে এক রাত্রি বাস করিয়া, ভরত ও শত্রুঘ্ন ভরদ্বাজেরই নির্দ্দেশ মত পরম রমণীয় চিত্রকূট পর্ব্বতে আসিয়াছিলেন।

অনার্য্য পর্ব্বত-গুহাবাসী চণ্ডালের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া আর্য্য-রাজাগণের মধ্যে রামই প্রথম ভারতের অনার্য্য অধিবাসীদের সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ করেন। গুহক প্রথম সাধারণভাবেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র যখন তাঁহাকে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন, চণ্ডাল বলিয়া বিন্দুমাত্র ঘৃণা করিলেন না, তখন গুহক একেবারে মুগ্ধ হইলেন। সেইদিন হইতে তিনি রামের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত হইলেন।

ভরত যখন লোকজন লইয়া গুহকের রাজধানীর কাছে আসিলেন, তখন তিনি রামের সহিত বিরোধ করিতে যাইতেছেন মনে করিয়া, গুহক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন; পরে ভরতের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া নিজেই পথ দেখাইয়া লইয়া গেলেন।

লক্ষ্মণও দূরে কোলাহল শুনিয়া, গাছের উপর উঠিয়া, ভরতের সঙ্গে বহুলোক দেখিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ, তোমার ভয় মিথ্যা। ভরত তেমন নয়! ভাল করিয়া দেখ।

তখন লক্ষ্মণ ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই ভরত দীনবেশে পদব্রজে আসিতেছেন। তখন লজ্জিত হইয়া তিনি গাছের উপর হইতে নামিয়া আসিলেন।

বহুদিন পরে আবার চারি ভাইয়ের মিলন হইল। ভরতের মুখে দশরথের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া রামচন্দ্র অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইলেন। পরে অশৌচান্ত করিয়া, বনজ ফলমূল দিয়া পিতার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন।

যাহা হউক—শোকের প্রথম বেগ মন্দীভূত হইলে ভরত রামকে কহিলেন, আপনাকে ফিরিতে হইবে আর্য্য! "তোমা বিনা অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার!"

রামচন্দ্র সস্নেহে উত্তর দিলেন, তা হয় না ভাই, পিতার সত্য স্মরণ করিয়া দেখ।

ভরত কহিলেন, সে ত বিমাতার ষড়যন্ত্র!

রাম কহিলেন, কৈকেয়ী বিমাতা নহেন ভাই, তিনি আমারও মা! তাঁহাকে অসম্মান করিও না—তিনি এমনিই অনুতাপে দগ্ধ হইতেছেন। আর তাহা ছাড়া পিতার বাক্য কোন মতেই মিথ্যা হইতে দেওয়া উচিত নয়। তুমি ফিরিয়া যাও, চৌদ্দবৎসর সময় দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে—এই সময়টা তুমিই রাজ্য-শাসন কর।

আমি! আমি রাজা হইতে পারিব না—অযোধ্যায়ও যাইতে পারিব না। রাম-হীন রাজ্যে থাকিতে পারিব না, তবে প্রজা যখন পালন করিতেই হইবে, তোমার ঐ পবিত্র খড়ম-জোড়া দাও—উহারাই অযোধ্যায় রাজা হইয়া থাকিবে; আমি তোমার প্রতিনিধি ও বিশ্বস্ত অনুচর হইয়া রাজ-কার্য্য চালাইব।

রাম ভরতের ভ্রাতৃভক্তি দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। খড়ম-জোড়াটি তিনি ভরতের হাতে দিলেন।

ভরত পাদুকাদ্বয় লইয়া মাথায় ঠেকাইলেন, বুকে ধরিলেন; বলিলেন—আর এক কথা। চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ হইবামাত্র কিন্তু তোমাকে অযোধ্যায় ফিরিতে হইবে। আমি দিন গণিব, ঠিক দিনে যদি তোমাদের না দেখিতে পাই, তবে আমি আগুনে ঝাঁপ দিব অথবা সরযূতে ডুবিয়া মরিব।

রাম বলিলেন—কিছুই করিবে না ভাই, আমি যথা সময়ে অযোধ্যায় ফিরিব। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা সুখে-স্বচ্ছন্দে থাক! বড় দুঃখ যে, অযোধ্যায় ফিরিয়া আর বাবাকে দেখিতে পাইব না। তুমি গুরুজনদের চরণে আমাদের প্রণাম জানাইবে; রাজপুরবাসিগণকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানাইও; প্রজাদের আশীর্ব্বাদ দিও; সকলকে বলিও, আমরা ভালআছি।

ভাল আছেন! ভরতের মুখ-চোখ ভার হইয়া আসিল। রাজপুত্র, রাজপুত্র-বধূ—আজ বনে, চীর-পরিহিত, ফলমূলসেবী! হায়! একদিন নানাবিধ রাজভোগ ছিল যাঁহাদের আহার, মহামূল্য বস্ত্র ছিল যাঁহাদের বসন, তাঁহাদের দিকে চক্ষু মেলিয়া যে দেখা যায় না, সোনার অঙ্গে এ কি বেশ! আশ্রয়—বৃক্ষ-তল; আহার—বৃক্ষ-ফল; পানীয়—ঝরণার জল; শয্যা—অজিন, উপাদান-হীন, বাহু-সম্বল!

ভরত ও শত্রুঘ্ন কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় লইলেন। রামকে প্রণাম করিয়া, সীতার পায়ের ধূলি লইয়া লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া, নতমুখে ধীরে বন-পথ ধরিয়া চলিলেন। মাথায় সেই পাদুকাদ্বয়!

অযোধ্যায় ফিরিয়া শহরের বাহিরে রাজ-পরিষদ স্থাপন করিয়া ভরত নিজ-প্রতিজ্ঞা মত রামের পাদুকাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি ও শত্রুঘ্ন সন্ন্যাসীর বেশে পাদুকার প্রতিনিধিরূপে রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

'রত্ন সিংহাসনে ভরত পট্ট পাতি।
তদুপরি পাদুকা থুইয়া ধরে ছাতি॥
তার নীচে শ্রীভরত কৃষ্ণসার চর্ম্মে।
পাত্র-মিত্র সহিত থাকেন রাজকর্ম্মে॥

এই ভাবে মন্থরার কু-অভিসন্ধি ব্যর্থ হইয়া গেল।

অরণ্যকাণ্ড

চিত্রকূট পর্ব্বতে কিছুদিন বাস করিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন। সেখান হইতে তাঁহারা পঞ্চবটী বনে গেলেন।

পঞ্চবটী বন অতি সুন্দর স্থান; পঞ্চবটীর শোভা অতুলনীয়। বাঙলার মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ-বধ' কাব্য হইতে পঞ্চবটীর শোভা সম্বন্ধে কতকাংশ আমরা নিম্নে তুলিয়া দিতেছি। পড়িলে সেই সুন্দর স্থান সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হইবে।

সীতা-হরণের পর বিভীষণ-পত্নী সরমার সহিত সীতার সখ্যভাব জন্মিয়াছিল। সীতা সরমাকে বলিতেছেন—

* * *

কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুল-কুল নিত্য নিত্য কহিব কেমনে?
পঞ্চবটী-বন-চর-মধু নিরবধি
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি' সুস্বরে
পিকরাজ! কোন্ নারী কহ শশীমুখি
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি?

* * *

সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌর কর-রাশি-বেশে সুরবালা-কেলি
পদ্মবনে।

* * *



জটায়ু

রামায়ণ—পৃঃ ৭০

কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে ; দেখিতাম তরল-সলিলে
নূতন গগনে যেন, নব তারাবলী
নব-নিশাকান্ত কান্তি ! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত উপরে, সখি বসিতাম আমি
নাথের চরণ তলে।

* * *

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা পঞ্চবটীতে প্রবেশ করিতেই এক বিরাট পক্ষী আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার নাম জটায়ু। জটায়ু তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। রামচন্দ্র পরিচয় দিলেন। শুনিয়া জটায়ু বলিল—তাই তোমাদিগকে আসিতে দেখিয়াই আমার মন যেন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। তোমরা রাজা দশরথের পুত্র, পুত্রবধূ? দশরথ যে আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

শুনিবামাত্র রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা তাহাকে প্রণাম করিলেন। জটায়ু বন্ধু-পুত্র ও পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করিল। রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই পঞ্চবটীতে একখানি পর্ণকুটীর বাঁধিয়া ফেলিলেন ; জটায়ু কুটির-নির্ম্মাণে তাঁহাদের অনেক সহায়তা করিল।

এই পঞ্চবটীতে তাঁহারা সুখের ঘর বাঁধিতে চাহিলেন ; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় তাহা সুখের হইল না। কত আশা করিয়াছিলেন, এই রম্য বনে, এই পর্ণকুটির খানিতেই তিনজনে চৌদ্দটি বৎসর অতিবাহিত করিবেন, কিন্তু তাহা হইল না।

কেন হইল না—তাহা বলিতেছি।

পঞ্চবটীর নিকটেই এক বনে অনেক রাক্ষস-রাক্ষসী বাস করিত। তাহাদের মধ্যে এক রাক্ষসী—তার নাম সূর্পনখা—একদিন পঞ্চবটীতে আসিয়া



আমি তোমাকে সুখী করিব, রাজা করিব, অনেক অর্থ দিব…

রামায়ণ—পৃঃ ৭২

উপস্থিত হইল। মানুষ বিবাহ করার তার বড় সখ। রামচন্দ্রকে মানুষ ও সুপুরুষ দেখিয়া সে তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল—তুমি আমাকে বিবাহ কর। আমাকে বিবাহ করিলে তুমি খুব সুখে থাকিবে; আমি তোমাকে রাজা করিয়া দিব।

রামচন্দ্র সীতাদেবীকে দেখাইয়া বলিলেন—আমি কৃতদার। আমার সুলক্ষণযুক্তা পত্নী তোমারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

রাক্ষসী সীতার দিকে চাহিতে পারিল না। দূরে চলিয়া গেল।

অদূরে লক্ষ্মণ দাঁড়াইয়াছিলেন। রাক্ষসী তাঁহার নিকটে গিয়া আবদার ধরিল—ওহে, তুমি ত আর কৃতদার নহ! আমি রাজার মেয়ে, রাজার বোন—আইবুড়ো আছি, তুমি আমাকে বিবাহ কর। আমি তোমাকে সুখী করিব, রাজা করিব, অনেক অর্থ দিব, হাতী-ঘোড়া যাহা চাও দিব।

লক্ষ্মণ হাসিয়া বলিলেন—দূর হ রাক্ষসী।

এত বড় স্পর্দ্ধা, রাক্ষসী বলা! তবে রে!—রাক্ষসী চটিয়া গিয়া তাঁহাদের গিলিয়া খাইতে গেল; লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ এক বাণ ছুঁড়িয়া তাহার নাক-কান কাটিয়া দিলেন।

সূর্পনখা নাক-কান হারাইয়া রাক্ষসদের কাছে গিয়া সব বলিল। শুনিয়া রাক্ষসদের সব রাগ বাড়িয়া গেল; তাহারা ক্ষুদ্র মানুষ তিনটাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে তখনই ছুটিয়া আসিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহারাই সব মরিয়া গেল। একটা কি করিয়া বাঁচিয়া গিয়াছিল, সেই খবরটা লইয়া তাহাদের রাজার কাছে গেল।

তাহাদের রাজা থাকিতেন লঙ্কায়। তাঁহার নাম রাবণ। এই রাবণের একটু ইতিহাস আছে :

সুমালী নামক এক রাক্ষসের কন্যা নিকষা ঋষি-বিশ্রবার নিকটে গিয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা জানায়। বিশ্রবা দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে

বিবাহ করেন। দেবতাদের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের দেবতা কুবের বিশ্রবার প্রথমা স্ত্রীর পুত্র। ইনিই স্বর্ণ-নির্ম্মিত লঙ্কাপুরীর রাজা ছিলেন। নিকষার কুবেরের উপর দারুণ ঈর্ষা ছিল। সে বিশ্রবাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার নিকট দুইটি মহাবলবান এবং একটি ধার্ম্মিক পুত্র কামনা করিল। ঋষির বরে তাহার তিনটী পুত্রই জন্মিল—রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ!

প্রথম দুইটি হইল মহাবলবান এবং শেষেরটি ঋষির বরে ধার্ম্মিক হইয়া জন্মিল।

ছেলেরা বড় হইলে নিকষা তাঁহাদের বলিল, কুবের তোমাদেরই ভাই, অথচ দেখ, সে তোমাদের অপেক্ষা কত সুখ-ভোগ করিতেছে। এ সমস্তই তাহার তপস্যার জোরে। তোমরাও তপস্যা কর।

নিকষার কথা মত তিন ভাই তপস্যা করিতে গেলেন। রাবণ ভীষণ বলবান ছিলেন, দশটা মাথা তাঁহার, কুড়িটা হাত। তাহার উপর আরও বলবৃদ্ধির জন্য তাঁহার তপস্যা। তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া যখন ব্রহ্মা বর দিতে আসিলেন, তখন রাবণ প্রথমে অমরত্ব চাহিলেন।

ব্রহ্মা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, অমরত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। তখন তিনি কহিলেন, বেশ, তবে এই বর দিন, যাহাতে দেব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর কেহই আমাকে বধ করিতে না পারে।

ব্রহ্মা কহিলেন, তথাস্তু।

রাবণ মানুষের কিম্বা পশুর কথা বলিলেন না। কারণ ইহারা ত তাঁহার ভক্ষ্যের মধ্যে—ইহাদের কথা আর কি ধরিবেন? কিন্তু এই অহঙ্কারই রাবণের সর্ব্বনাশের মূল হইল।

যাহা হউক—ইহার পর কুম্ভকর্ণের বর লইবার পালা।

কুম্ভকর্ণকে শুধু চোখে দেখিয়াই দেবতাগণের ভয়ের অবধি ছিল না—এই লোকটা আবার যদি ব্রহ্মার বরে বলবৃদ্ধি করে, তাহা হইলে ত আর রক্ষা

থাকিবে না! দেবতারা তখন জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর শরণ লইলেন। সরস্বতীর প্রভাবে কুম্ভকর্ণের শুভবুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সে বর চাহিল, আমি যেন খুব ঘুমাইতে পাই—এক-এক দমে ছয় মাস করিয়া আমি ঘুমাইব!

ব্রহ্মা হাসিয়া কহিলেন, তথাস্তু!

রাবণ শুনিয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন, কিন্তু তখন আর উপায় কি?

বিভীষণ ধার্মিক মানুষ। তিনি বর চাহিলেন, ধর্মে যেন আমার চিরকাল মতি থাকে।

ব্রহ্মা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, তথাস্তু। উপরন্তু তোমার উপর আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ রহিল!

ব্রহ্মার কাছে বর লইয়া, রাবণ পুনশ্চ শিবকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে নানারূপ সাংঘাতিক অস্ত্র আদায় করিয়া লইলেন। তাহার পর শুরু হইল তাঁহার বিজয়-যাত্রা। প্রথমেই তিনি কুবেরকে হারাইয়া লঙ্কাটি কাড়িয়া লইলেন। কুবের কোনমতেই আঁটিতে না পারিয়া, নিজের লোকজন লইয়া কৈলাস-পর্ব্বতে শিবের আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন। ইহার পরে নানা যুদ্ধে দেবতাদের বিপন্ন করিয়া স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে রাবণ একাধিপত্য বিস্তার করিলেন।

তবে রাবণ যে কখনও জব্দ হন নাই, তাহা নহে। যে মানুষ ও পশুকে তিনি অগ্রাহ্য করিতেন, সেই পশুরই মধ্যে একজন বানররাজ বালীর হাতে একবার তাঁহাকে রীতিমত লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছিল। আরও দুই-একবার তিনি অপদস্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু মোটের উপর প্রবল প্রতাপেই রাজত্ব করিতেছিলেন।

এই রাবণেরই ভগিনী সূর্পনখা। একমাত্র ভগিনী—সুতরাং আদরের। তাহার উপর একবার না জানিয়া সূর্পনখার স্বামীকে রাবণই মারিয়া ফেলেন, সেইজন্য সূর্পনখার কাছে রাবণ একটু লজ্জিতও ছিলেন।

সুতরাং সুর্পনখার লাঞ্ছনা ও স্বজন হত্যার-সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণ তখনই প্রতিশোধ লইবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিলেন। কিন্তু সোজাসুজি যুদ্ধ না করিয়া, রাম ও লক্ষ্মণকে সাংঘাতিক ভাবে জব্দ করাই হইল তাঁহার উদ্দেশ্য এবং তিনি সেই মতলবই আঁটিতে লাগিলেন।

সেই যে তাড়কার পুত্র মারীচ—যে রামের হাতে একবার মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছিল—রাবণ শেষ পর্য্যন্ত তাহারই শরণাপন্ন হইলেন। মারীচ অনেক রকম জাদু জানিত। রাবণ তাহাকে অনুরোধ করিলেন, তুমি সোণার হরিণের রূপ ধরিয়া একবার রাম-সীতার সম্মুখ দিয়া ছুটিয়া পলাইয়া যাও।

মারীচ সভয়ে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সে আমি পারিব না। রাম সহজ মানুষ নহেন, তাহা আমি ভালভাবেই জানি। পুনরায় তাঁহার সহিত আলাপ করিবার আমার ইচ্ছা নাই!

তখন রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তুমি যদি আমার কথা না শোন, তাহা হইলে আমি এখনই তোমাকে মারিয়া ফেলিব।

মারীচ দেখিল, তাহার আসন্ন সময়ের আর দেরি নাই। হয় তাহাকে রামের হাতে মরিতে হইবে, নহিলে রাবণের হাতে; রাবণের হাতে মরার চেয়ে রামের হাতে মরাই ভাল। বিশেষ করিয়া, সেখানে তবু পলায়নের সুযোগ আছে, কিন্তু এ যে একেবারে সাক্ষাৎ মৃত্যু! সে অগত্যা সম্মত হইয়া কহিল, আচ্ছা তাহাই হইবে। তুমি যাহা বলিতেছ আমি তাহাই করিব।

তখন রাবণ তাহাকে সব বুঝাইয়া দিলেন।

রাম, লক্ষ্মণ, সীতা পঞ্চবটীতেই আছেন।

একদিন তিনজনে কুটীর-সম্মুখে বসিয়া আছেন, হঠাৎ একটি সোনার হরিণ এক বন হইতে বাহির হইয়া অন্য বনে প্রবেশ করিল। সীতা রামকে বলিলেন—নাথ, হরিণটি আমায় ধরিয়া দাও।

প্রথমটা রাম বলিলেন, হরিণ কখনও সোনার হয়? ওটা নিশ্চয় কাহারো মায়া!

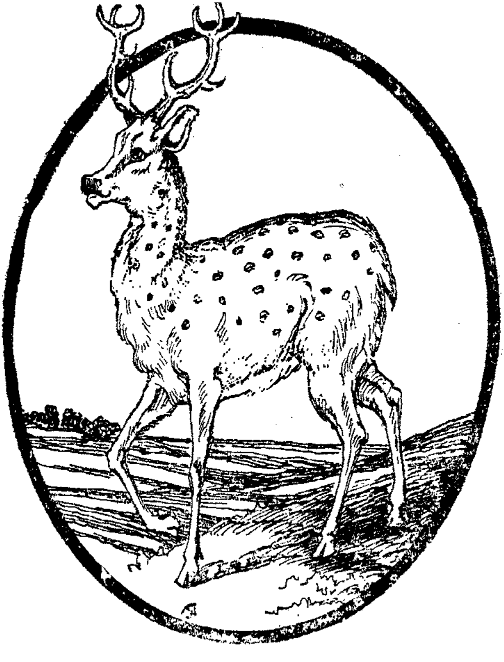
কিন্তু সীতার বড় সখ—ঐ হরিণটি চাই!

সীতার আবদার ত রাম অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। সীতার মত স্ত্রী জগতের কয়জন পুরুষের ভাগ্যে জুটিয়াছে? রাজার নন্দিনী, রাজার ঘরণী হইয়াও স্বেচ্ছায় তিনি এই দারুণ বনবাস-কষ্ট সহিতেছেন। তাঁহার আব্দার রক্ষা করিবেন না? বাস্তব পক্ষে স্বর্ণমৃগ হয় না, রামচন্দ্র তাহা জানিতেন। দ্বিধা তাঁহার মনে যথেষ্টই জাগিয়াছিল, তবে হইলেও হইতে পারে, এই ভাবিয়া এবং সীতার অনুরোধে তীর-ধনুক-হস্তে মৃগ যে বনে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই বনে তিনি প্রবেশ করিলেন।

সেটা সত্যই মৃগ নয়—রাবণ-রাজা মায়া-মৃগ দেখাইয়া রামকে সীতার নিকট হইতে দূরে লইয়া গিয়াছিল। রাম যত যান, মৃগ ততই দৌড়িয়া গভীর বনে প্রবেশ করে। রাম যখন অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন, তখন মায়া-মৃগ অদৃশ্য হইয়া গেল। রাম আরও বেশী করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সীতার অনুরোধ—হরিণটা জীবন্তই চাই। সুতরাং তিনি তীরও নিক্ষেপ করিতে পারিতেছিলেন না।

এদিকে রাবণ নিজে—যেখান হইতে সীতা ও লক্ষ্মণ শুনিতে পান সেইরকম একটা স্থানে আসিয়া—রামের গলার স্বর নকল করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা সীতা, হা লক্ষ্মণ, আর বুঝি ফিরিতে পারিলাম না—আর বুঝি তোমাদের সঙ্গে দেখা হইল না!

সীতা এ-স্বর শুনিয়া বড় ভয় পাইলেন ও লক্ষ্মণকে রামের উদ্দেশে যাইতে বারবার অনুরোধ করিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ ভয় আদৌ পান নাই; কারণ তিনি জানিতেন, রামচন্দ্রের অনিষ্ট করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। তাই সীতার কথা তিনি না রাখিয়া সীতার রক্ষণাবেক্ষণেই নিযুক্ত রহিলেন।



মায়া-মৃগ

রামায়ণ—পৃঃ ৭৬

তখনও রামের কণ্ঠের 'হা সীতা, হা লক্ষ্মণ' বিলাপ-ধ্বনি শোনা যাইতেছিল। সীতা অত্যন্ত কাতরভাবে অনুরোধ করিয়াও যখন লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যে পাঠাইতে পারিলেন না, তখন অত্যন্ত কটু কথা বলিয়া লক্ষ্মণকে তিরস্কার করিলেন। সে-তিরস্কার লক্ষ্মণের প্রাণে শেলের মত বাজিল; লক্ষ্মণ ধনুকের দ্বারা মাটিতে রেখা কাটিয়া একটি গণ্ডি করিয়া দিলেন এবং সীতাকে সেই মন্ত্রপূত গণ্ডি হইতে বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়া, তখনই বন-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

রাবণ জানিতেন যে, ঠিক ইহাই হইবে। তাই যতক্ষণ না লক্ষ্মণ সীতাকে কুটিরে একাকী ফেলিয়া রামের সন্ধানে যাইলেন, ততক্ষণ তিনি বনেই লুকাইয়া রহিলেন। লক্ষ্মণ চলিয়া যাইতেই, রাবণ বনবাসী ভিক্ষুকের মত পোষাকে সাজিয়া সীতার সম্মুখে আসিয়া ভিক্ষা চাহিলেন।

সীতা তখন রামের জন্য আকুলি-বিকুলি করিতেছেন—ভিক্ষা দিবার সময় তাঁহার নয়। তিনি শুনিতেই পাইলেন না। রাবণ পুনঃ পুনঃ ডাক দিয়াও সাড়া না পাইয়া, চীৎকার করিয়া বলিলেন—তবে কি গৃহস্থের দ্বার হইতে ভিক্ষুক ফিরিয়া যাইবে?

এ-কথায় সীতার চমক ভাঙ্গিল। দ্বার হইতে শূন্য হস্তে ভিক্ষুক ফিরিবে! সে যে বড় অমঙ্গলের কথা। সীতা আদর্শ হিন্দু নারী, তিনি কি তাহা হইতে দিতে পারেন? ফিরিয়া দেখিলেন, ভিক্ষুকই বটে!

বলিলেন—একটু দাঁড়াও, ভিক্ষা আনিয়া দিতেছি।

কুটির-মধ্য হইতে সীতা অর্ঘ্য সাজাইয়া আনিয়া ভিক্ষুককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—সরিয়া আইস, আমি ভিক্ষা আনিয়াছি।

ভিক্ষুক নড়িলেন না; সেইখানে দাঁড়াইয়াই বলিলেন, ঘরের বাহিরে আসিয়া না দিলে আমি লইতে পারিব না। তুমি আসিয়া দিয়া যাও।

সীতা কি করেন, অগত্যা তাহাই করিলেন। কুটির ছাড়িয়া তিনি

ভিক্ষুকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আর যায় কোথা? রাবণ তাঁহাকে বগলের মধ্যে চাপিয়া ছুটিতে লাগিলেন। সীতা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন…কোথায় সর্ব্বগুণবান স্বামী রামচন্দ্র! কোথায় আমার অনুগত দেবর লক্ষ্মণ! তোমরা কোথায় আছ? ছুটিয়া আইস! দেখ, চোরে সীতাকে চুরি করিয়া লইয়া পলাইতেছে। হে স্বামিন্, হে লক্ষ্মণ! তোমরা কোথায়! তোমরা কোথায়!

সে-কান্নায় রাবণের দৃক্‌পাতও নাই; তিনি বোঁ বোঁ শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছেন। কখনও তিনি মাটির উপর দিয়াই যাইতেছেন, কখনও-বা রাক্ষস-মায়া-বলে শূন্য-পথেই চলিয়াছেন।

সীতা কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছেন, হায় হায়! কেন মরিতে স্বর্ণ-মৃগের উপর আমি লোভ করিতে গিয়াছিলাম! রাম ও লক্ষ্মণ স্বর্ণ-মৃগ ধরিতে না গেলে, পৃথিবীতে এরূপ সাধ্য কাহার হইত যে সূর্য্যবংশের বধূকে চুরি করিয়া লইয়া পালায়? হে দীনের বন্ধু, বিপন্নের উদ্ধার-কর্ত্তা ভগবান্, তুমি ত সব দেখিতেছ, তুমি ত সর্ব্বশক্তিমান, তুমি দয়া করিয়া এ-সংবাদ আমার স্বামীকে জানাইয়া দাও! হে বিশ্বভ্রমণকারী বায়ু, আমার রামচন্দ্র কোথায়, তাহা ত তোমার অজানা নাই—তুমি তাঁহাকে ত্বরায় সংবাদ প্রদান কর। হে পৃথিবীর চক্ষু সূর্য্যদেব, আমার প্রিয়তমকে ত তুমি দেখিতে পাইতেছ—দয়া করিয়া তাঁহাকে বল যে, তাঁহার সর্ব্বস্ব দস্যুতে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে! দয়া করিয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দাও, বলিয়া দাও—এই দিকে—এই দিকে! হে নদি! তুমি ত সব দেশে যাও, সকলকেই দেখিতে পাও, তুমি আমার রামচন্দ্রকে বল, দস্যু সীতাকে লইয়া এই পথে পলায়ন করিতেছে।—সীতা নিজেও তাঁহার অঙ্গ হইতে অলঙ্কারাদি খুলিয়া এক-একখানি করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। মনে আশা, এই গহনা দেখিয়াই রাম ও লক্ষ্মণ দস্যুর গতি-নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন!

রাবণ এখন শূন্য দিয়া চলিতেছেন। সীতার বিলাপ-ধ্বনি আর পৃথিবী হইতে শোনা যাইতেছে না—সীতাও হতাশ হইয়া পড়িলেন।

জটায়ুর কথা মনে আছে কি? দশরথের বন্ধু জটায়ু? সেই জটায়ু শূন্য দিয়া কোথায় যাইতেছিলেন। হঠাৎ রমণী-কণ্ঠের কান্নার শব্দ শুনিয়া তিনি যে-দিক হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে গেলেন। সীতার কণ্ঠ চিনিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। জটায়ু তাঁহার পাখা দিয়া রাবণের পথরোধ করিয়া বজ্রনির্ঘোষে কহিলেন, পাপিষ্ঠ, দশরথের পুত্রবধূকে লইয়া কোথায় যাস্? জানিস্ না যে জটায়ু এখনও বাঁচিয়া আছে?

রাবণ বিপদ দেখিয়া নিজমূর্ত্তি ধরিলেন। দশ মুণ্ড, কুড়ি বাহু—বিপুল সে চেহারা! কিন্তু জটায়ুর বিক্রমও ত সহজ নয়! তিনি ভয় পাইলেন না, বরং বিশাল পাখা নাড়িয়া সবেগে রাবণকে আক্রমণ করিলেন।

তখন উভয়ে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। রাবণের হাতে অস্ত্র, জটায়ুর শুধু নখ ও দন্ত ভরসা। তিনি তাহার দ্বারাই রাবণের মুণ্ডগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন, কিন্তু মায়াবলে তাঁহার তৎক্ষণাৎ মুণ্ড পুনরায় গজাইয়া উঠিল। নিরস্ত্র জটায়ু পুনঃপুনঃ অস্ত্রাঘাতে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু তবুও রাবণ প্রমাদ গণিলেন, কারণ অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও এই বিরাট পাখীটি তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন!

কিন্তু সীতার অদৃষ্ট মন্দ! হঠাৎ এক সময়ে এক সুযোগে রাবণ জটায়ুর একটি পাখা কাটিয়া দিলেন। জটায়ু আর শূন্যে থাকিতে পারিলেন না, রক্ত-বমন করিতে করিতে মাটিতে পড়িয়া গেলেন। রাবণ এবার নিরুদ্বেগে সীতাকে লইয়া লঙ্কায় পৌঁছিলেন।

এদিকে অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন স্বর্ণ-মৃগটিকে ধরিতে পারা গেল না, রাম তখন হরিণটিকে বাণ-বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় দেখা গেল, সে আর কেহ নয়—মারীচ। রাম দ্রুতপদে গৃহ-মুখে ফিরিতে লাগিলেন।

পথে লক্ষ্মণের সহিত দেখা হইতে রাম সীতার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। সীতাকে ফেলিয়া আসা অন্যায় হইয়াছে বলিয়া লক্ষ্মণকে তিনি তিরস্কারও করিলেন, কিন্তু তখন আর উপায় কি ?

দু'জনে ছুটিতে ছুটিতে ঘরে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহারা যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে—কুটির শূন্য, গৃহলক্ষ্মী সীতা গৃহে নাই।

উভয়ে মিলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ডাকাডাকি করিলেন; সীতা আসিলেন না। রামচন্দ্র প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—সীতা! সীতা! আমি ডাকিতেছি। সীতা, তুমি কোথায় আছ? উত্তর দাও, উত্তর দিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও! সীতা! সীতা!

বন শূন্য প্রতিধ্বনি ফিরাইয়া দিল…সীতা! সীতা!

লক্ষ্মণের মনে গোড়া হইতেই কেমন একটা সন্দেহ জাগিয়াছিল; তিনি বলিলেন—দাদা, আমার কেমন ভাল বোধ হইতেছে না। কোন দুষ্ট সীতাকে হরণ করিল না ত?

রামের মনেও সেই সন্দেহ জাগিয়াছিল। তখন দুইভাই বন-পথ ধরিয়া অশ্রু গদগদকণ্ঠে সীতার নাম করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া এক স্থানে একটি বলয় কুড়াইয়া পাইলেন! সীতা এ-বলয় পরিতেন—উভয়েই চিনিতে পারিলেন। তবে আর কোন ভুল নাই—সেই সর্ব্বনাশই হইয়াছে। নিশ্চয়ই কেহ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

"প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল।
দেখেন সর্ব্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল॥
পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুই বীর।
উলটি পালটি যত গোদাবরী তীর॥
গিরি গুহা দেখেন মুনির তপোবন।
নানাস্থানে সীতারে করেন অন্বেষণ॥

এইরূপে একস্থানে যান শতবার।
তথাপি না পান দেখা শ্রীরাম সীতার॥
কান্দিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আঁখি।
রামের ক্রন্দনে কান্দে বন্য পশু পাখী॥
রামের আশ্রমে আসি যত মুনিগণ।
রামেরে কহেন কত প্রবোধ বচন॥
উপদেশ বাক্য নাহি মানেন শ্রীরাম।
সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণগ্রাম॥
সীতা সীতা বলিয়া পড়েন ভূমিতলে।
করেন লক্ষ্মণ বীর শ্রীরামেরে কোলে॥
রঘুবীর নহে স্থির জানকীর শোকে।
হাহাকার বারে বারে করে দেবলোকে॥
বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে॥
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ॥
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী।
লুকাইয়া আছে কি লক্ষ্মণ দেখ দেখি॥
বুঝি কোন মুনি-পত্নী সহিত কোথায়।
গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায়॥
গোদাবরী তীরে আছে কমল কানন।
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ॥
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া॥



জটায়ু ধুঁকিতেছিল—ডাকিল, কে ? রাম ?

রামায়ণ—পৃঃ ৮৪

চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস॥
দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ।
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন॥
আমি জানি পঞ্চবটী অতি পুণ্যস্থান।
তেঁই সে এ বনে করিলাম অবস্থান॥
তাহার উচিত ফল দিলে হে আমারে।
শূন্য দেখি তপোবন সীতা নাই ঘরে॥
শুন পশু মৃগ পক্ষী শুন বৃক্ষলতা।
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা॥"

আর কিছুদূর চলিয়া আর একখানি গহনা পাওয়া গেল। হায়! হায়! অদৃষ্টে এও ছিল। আবার চলিলেন! সে পাষণ্ড যেই হোক, তাহাকে শাস্তি দিয়া সীতাকে উদ্ধার করিয়া আনিতেই হইবে। রাম ও লক্ষ্মণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন।

ছুটিতে ছুটিতে এক জায়গায় আসিয়া জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন।

পথের ধারে পড়িয়া জটায়ু ধুঁকিতেছিলেন—ডাকিলেন, কে? রাম?

পিতৃ-বন্ধু বলিয়া জটায়ুকে ইহারা কাকা বলিয়া সম্বোধন করিতেন; বলিলেন—হ্যাঁ কাকা, আমরা রাম ও লক্ষ্মণ। আপনি এখানে এ-অবস্থায় পড়িয়া কেন?

জটায়ু বলিলেন, লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে—আমি বাধা দিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই।—এইটুকু বলিয়াই তাঁহার প্রাণ দেহ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। রাম ও লক্ষ্মণ পিতৃব্যের সৎকার করিয়া, আবার সীতার অন্বেষণে চলিলেন।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

কিষ্কিন্ধ্যার রাজার দুই ছেলে—বালী আর সুগ্রীব। দুই ভাইয়ে বহু-দিনের বিবাদ ছিল। বালীর গায়ে জোর বেশী, বালী বেশী বুদ্ধিমান, তাই সুগ্রীব তাহার সঙ্গে পারিয়া উঠিল না—বালী সুগ্রীবকে মারিয়া-ধরিয়া রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিল। সুগ্রীব মনের দুঃখে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আসিয়া বাস করিতেছে। বালীকে তাহার এখনও ভারি ভয়; সদাই সে সন্ত্রস্ত থাকে···কখন বালী নিজে আসিয়া বা লোক পাঠাইয়া তাহাকে মারিয়া কাটিয়া ফেলে—এ-ভয় তাহার সর্ব্বদাই।

সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে রাম ও লক্ষ্মণ এই কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া, যেখানে সুগ্রীব প্রভৃতি লুকাইয়া ছিল সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তাহাদের সুদৃশ্য আকৃতি ও বীরজনোচিত চেহারা দেখিয়া সুগ্রীবের মন্ত্রী হনুমান তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া ডাকিয়া আনিল। তখন লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের পরিচয় দিলেন।

রাম ও লক্ষ্মণের নাম ও তাঁহাদের বীরত্ব-কাহিনী না শুনিয়াছে কে? হর-ধনুভঙ্গকারী রাম, পরশুরামজয়ী রাম, পিতৃ-সত্য-পালনে বনবাসী রাম এই সম্মুখে! সুগ্রীব কাঁদিতে কাঁদিতে রামের পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

আগেই বলিয়াছি, সুগ্রীবের এক বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিল, তাহার নাম হনুমান। হনুমান বড় বুদ্ধিমান্। সে সুগ্রীবকে বলিল, রাজা, এত দিন ধরিয়া বালীর যে সব অত্যাচার সহিয়াছেন, এইবার সে সকলের প্রতিকার হইবার আশা হইয়াছে। রাজা, রাম ও লক্ষ্মণ আপনার সহায় থাকিলে, আপনি পৃথিবীর রাজ্য অধিকার করিতে পারিবেন। উঁহাদের পা ধরিয়া বলুন, আপনারা যাহা বলিবেন, তাহাই করিব—আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হৌন।

সুগ্রীব তাহাই করিল।

রাম সুগ্রীবকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন—সুগ্রীব, আর বেশী বলিতে হইবে না। বল, তোমার কি দুঃখ?

সুগ্রীব বলিল—প্রভু, আপনাদের দেখিয়া আমার চেয়ে আপনাদের অধিকতর বিপন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। অগ্রে আপনার কথাই বলুন।

রাম তখন সীতা-হরণ-বৃত্তান্ত বলিলেন। শুনিয়া সুগ্রীব বলিল—তবেই ঠিক হইয়াছে। সেদিন একটা রাক্ষস কোনও স্ত্রীলোককে লইয়া যাইতেছিল বটে! এখন দেখিতেছি, তিনিই সীতা। তিনি এইখানেই তাঁহার গায়ের একখানি গহনা আর ওড়না ফেলিয়া দিয়াছিলেন, আমরা তাহা কুড়াইয়া রাখিয়াছি। এই দেখুন।

রাম যখন মায়ামৃগ ধরিতে যান, তখন সীতার গায়ে এই ওড়নাটিই দেখিয়া গিয়াছিলেন—বেশ মনে আছে। গহনাও সীতার।

লক্ষ্মণ গহনা ও ওড়না দেখিয়া বালকের মত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; রামেরও অন্তর কাঁদিতেছিল, তিনি অতি কষ্টে অশ্রু রোধ করিতেছিলেন।

সুগ্রীব বলিল—বন্ধু, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, সীতা উদ্ধার করিবই! রাবণ যত বড় রাক্ষস আর যত বড় বীরই হোক, আমার বানর-সৈন্যের সঙ্গে কিছুতেই সে পারিবে না। আমরা তাহাকে মারিয়া, দেবীকে উদ্ধার করিয়া আনিবই।

রাম সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বন্ধু, এইবার তোমার দুঃখের কথা আমাকে খুলিয়া বল। আমি দেখি, তোমার জন্য আমি কি করিতে পারি?

সুগ্রীব সে-পর্যন্ত বালীর নিকট হইতে যত নির্যাতন পাইয়াছিল, সবিস্তারে রামচন্দ্রের নিকট তাহা বলিল। সে-যে তাহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহাও বলিল।

শুনিয়া রাম বলিলেন—ভাই সুগ্রীব, আমি তোমাকে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে বসাইব, প্রতিজ্ঞা করিলাম।

তখন উভয়েই অগ্নি-সাক্ষী করিয়া বন্ধুত্ব-বন্ধনে বদ্ধ হইলেন।

তাহার পর সুগ্রীব দলবলে কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়া বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করিল। বালী ত আর রাম-লক্ষ্মণের সংবাদ জানিত না! অন্যবারের মত সুগ্রীবের আস্ফালন বৃথা ভাবিয়া, "দাঁড়া, দাঁড়া, তোকে মজা দেখাইতেছি"—বলিয়া রুখিয়া আসিল!

তখন দুইজনে মল্ল-যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল।

কিন্তু রামচন্দ্র মুশকিলে পড়িলেন। কথা ছিল, রাম আড়াল হইতে বাণ মারিয়া বালীকে মারিয়া ফেলিবেন; কিন্তু দুই জনকেই এক রকম দেখিতে—রাম কাহাকে বাণ মারিবেন? ফলে তিনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সুগ্রীব বালীর হাতে যৎপরোনাস্তি নির্য্যাতিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া খুব রাগারাগি করিতে লাগিল, কিন্তু রামচন্দ্র তখন তাহাকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলেন। বলিলেন, কাল তুমি গলায় একটা মালা পরিয়া যাইও, যাহাতে আমি তোমায় চিনিতে পারি।

পরদিনও বালী খুব তর্জ্জন-গর্জ্জনে যুদ্ধ করিতে আসিল, কিন্তু কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর সুগ্রীব যেমন হারিয়া যায় যায় হইল, সেই সময় রামচন্দ্র বাণ ছুঁড়িলেন—বালী সঙ্গে সঙ্গে ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। লুটাইয়া পড়িবার সময় সে রামকে দেখিতে পাইল; দেখিতে পাইয়া রামকে ধিক্কার দিয়া বলিল—তোমার হাতে দেখিতেছি বীরের অস্ত্র, ধনুর্বাণ; কিন্তু তুমি কেমন বীর, তাহা ত বুঝিলাম না! আমাদের দু'জনে লড়াই হইতেছে, তুমি পশ্চাৎ হইতে আততায়ীর মত তীর মার—কেমন তোমার বীরত্বের অভিমান?

রাম বলিলেন—তুমি পাপী, তুমি অসৎ, তোমাকে বধ করিলে পাপ নাই—পুণ্য আছে।

বালীর মৃত্যু হইল। রামচন্দ্র সুগ্রীবকে রাজা ও বালীর পুত্র অঙ্গদকে যুবরাজ করিয়া দিলেন।

সুগ্রীব রাজা হইয়াই সীতা উদ্ধারে মন দিল। সম্মুখেই বর্ষাকাল বলিয়া, বাধ্য হইয়া কয়েক মাস বসিয়া থাকিতে হইল। তাহার পর সে যেখানে যত বানর ছিল, সব ডাকিয়া আনিল। রাবণ লঙ্কার রাজা হইলেও, সীতাকে লইয়া গিয়া যে কোথায় রাখিয়াছেন, তাহার কোনই স্থিরতা নাই; তাই সুগ্রীব দেশের চারিদিকে দূত পাঠাইয়া দিল। সুগ্রীবের মন্ত্রী হনুমানও সীতার অন্বেষণে গেল। রামচন্দ্র হনুমানের হাতে একটি আংটি দিয়া বলিলেন, এই আমার নিদর্শন; যদি সীতার দেখা পাও, এই নিদর্শনটি দেখাইও; তাহা হইলেই তিনি তোমাকে আমার লোক বলিয়া চিনিতে পারিবেন।

হনুমান আংটি লইয়া রামকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

তিন দিকে অন্বেষণ করিয়া তিন দিকেরই দূত ফিরিয়া আসিল। তাহাদের শুষ্ক মুখ দেখিয়াই রাম ও লক্ষ্মণ বুঝিলেন যে তাহারা সীতার সন্ধান পায় নাই। কেবল দক্ষিণ দিকের দূত ফিরে নাই—আশা এখনও সেই দিকেই আছে।

সেই দিকেই হনুমান গিয়াছিল। হনুমান দক্ষিণ-প্রদেশের সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া, সমুদ্রের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার ইচ্ছা—এইবার লঙ্কাটা ঘুরিয়া দেখিয়া আসে। কিন্তু মাঝে যে দুস্তর সমুদ্র।

হনুমান অনেক ভাবিল, কিন্তু সমুদ্র পার হইবার উপায় করিতে পারিল না। অথচ লঙ্কাটা না দেখিয়া সে ফিরিতেও পারে না। হনুমানের

সঙ্গে আরও কয়েকজন বানর ও জাম্বুবান ছিল। সকলেরই মত হইল যে, লঙ্কাটা দেখিয়া আসাই উচিত। কারণ যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় রাবণই সীতা হরণ করিয়াছে। কিন্তু অন্তরায় ঐ সমুদ্র। পার হওয়া যায় কি করিয়া?

হনুমান বলিল—আমি দেখি, কোন মতে সমুদ্রটা পার হইতে পারি কি না! তোমরা সব এইখানে অপেক্ষা কর—আমি না আসা পর্য্যন্ত কোথাও যাইও না।

জাম্বুবান ও বানরগণ তাহাতেই স্বীকৃত হইল। হনুমান মহেন্দ্র-পর্ব্বত-শিখরে উঠিল। পাহাড়ের উচ্চশৃঙ্গ হইতে লাফ দিয়া সমুদ্র পার হইবে—ইহাই তাহার ইচ্ছা।

পাহাড়ে উঠিয়া সে নিজের দেহটাকে খুব বড় করিল; এমন বড় করিল যে, তখন তাহার দিকে চাহে কাহার সাধ্য!

সুরশা নামে এক নাগিনী তাহার ঐ বিকট ফোলা চেহারা দেখিয়া, মস্ত এক হাঁ করিয়া তাহাকে গিলিতে গেল। হনুমান তাহার চুল ধরিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। আর এক রাক্ষসী ভয় পাইয়া হনুমানকে খাইবার জন্য হাঁ করিয়া দাঁড়াইল। হনুমান ইহাকে আর চুল ধরিয়া ছুঁড়িল না—সুড়ুক করিয়া তাহার পেটের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। তারপর রাক্ষসী যেমন মুখ বন্ধ করিয়াছে. অমনি হনুমান রাক্ষসীর পেটের চামড়া, নাড়ী-ভুঁড়ি সব ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল। রাক্ষসী মরিয়া গেল।

বেশ করিয়া গাটা ঝাড়িয়া লইয়া এইবার হনুমান এক লাফ দিল।

বিরাট তাহার গতি! নিমেষে সে রাবণের রাজধানী স্বর্ণলঙ্কায় আসিয়া পৌঁছিল।

সুন্দরকাণ্ড

সন্ধ্যা যখন হয় হয়, তখন হনুমান লঙ্কায় পৌঁছিল।

লঙ্কার ঘরে ঘরে সে সীতাকে খুঁজিয়া বেড়াইল, কোথাও সীতার দেখা পাইল না। ছোট একটি মর্কটের আকার ধরিয়া তখন সে রাবণ-রাজার বাড়ীতে ঢুকিল। সেখানেও সে পাতি পাতি করিয়া অন্বেষণ করিল, কিন্তু সীতাকে খুঁজিয়া পাইল না।

হনুমান মনের দুঃখে বাহির হইয়া যাইতেছে, এমন সময়ে চোখে পড়িল এক অশোক-বন!

মনে হইল, সেই বনে একটি যেন মানুষের মেয়ে! আর তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে একদল রাক্ষসী!

মর্কট উঁকি মারিয়া দেখিল—ঠিক ত! সীতাই!

মর্কট বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া লুকাইয়া দেখিতে লাগিল, মানুষের মেয়ের মত যে মেয়েটি—তিনি নিশ্চয় সীতা—মুখ নীচু করিয়া কাঁদিতেছেন; আর রাক্ষসীরা কাল মুখের সাদা সাদা দাঁত বাহির করিয়া, তাঁহাকে কি সব বলিতেছে। ইহারা চেড়ী। সীতাকে পাহারা দিবার জন্য রাবণ ইহাদের রাখিয়াছিলেন। মেয়েটি তাহাদের কথায় আরও যেন বেশী কষ্ট পাইতেছেন, এমনই বোধ হইতে লাগিল।

খানিক পরে—

রাক্ষসীরা মেয়েটিকে ফেলিয়া কিছুক্ষণের জন্য অন্য কোথায় গেল, আর হনুমানও গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল। কি বলিয়া সীতার সম্মুখীন হয়, এই সমস্যাই হনুমানকে বিব্রত করিয়া তুলিল। অবশেষে হনুমান বুদ্ধি করিয়া বলিল—শ্রীরামচন্দ্র!



অশোক-বনে সীতা

রামায়ণ—পৃঃ ৯০

সীতা চমকিয়া উঠিলেন।

হনুমান তাঁহাকে প্রণাম করিয়া রাম-প্রদত্ত আংটিটি বাহির করিয়া সীতার সম্মুখে ধরিল। সীতা এক-দৃষ্টিতেই সে আংটি চিনিতে পারিলেন। আংটিটি লইয়া মাথায়, বুকে ঠেকাইলেন। সীতার চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল।

এত দিনে কি রামের মনে পড়িল অভাগিনী সীতাকে।

হনুমান কাঁদিল; কাঁদিয়া সব বৃত্তান্ত তাঁহাকে খুলিয়া বলিল। বলিল—মা, আর আমরা ভাবি না। আপনাকে যখন দেখিতে পাইয়াছি, আপনার যখন সন্ধান পাইয়াছি, তখন আর ভাবি না, রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া আপনাকে আমরা শীঘ্রই এখান হইতে লইয়া যাইব। ক'টা দিন আপনি কষ্ট করিয়া থাকুন মা—তারপর এই রাবণকে আমরা দেখাইব, আমাদের দেবী চুরি করিবার কি সাজা!

হনুমান সীতাকে প্রণাম করিয়া বিদায় চাহিল।

সীতা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

হনুমান বলিল—মা, একটা কিছু নিদর্শন আমাকে দিন, প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে দেখাইব।

সীতার মাথায় চুলের মধ্যে তখনও একটি মণি ছিল—সেইটি তিনি হনুমানের হাতে দিলেন। হনুমান সেটিকে মাথায় ধরিয়া, অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া অশোক-বন পরিত্যাগ করিল।

পরিত্যাগ ত করিল, কিন্তু অমনি-অমনি লঙ্কা হইতে ফিরিয়া যাইবে সে? মনে হইল, একটা কিছু চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারিলেই যেন ভাল হয়! কথায় বলে 'বাঁদরে বুদ্ধি'! সেই বুদ্ধি লাগাইতেও দেরী হইল না। হনুমান তখন এক লাফে রাজার বাগানে উপস্থিত হইল—রাবণ-রাজার বাগান ভাঙিয়া দিল, হাতী-ঘোড়া মারিয়া একাকার করিতে লাগিল।

হনুমান যেখানে লঙ্কার বাগান ধ্বংস করিল, কবি কৃত্তিবাস তাহার বড় সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন—

ফল ফুল খায় বীর ছিঁড়ে আর পাতা।
উপাড়িয়া ফেলে গাছ কোথা বৃক্ষলতা॥
ডাল ভাঙ্গে হনুমান শব্দ মড়মড়ি।
আতঙ্কে রাক্ষস সব উঠে দড়বড়ি॥
উঠিয়া রাক্ষসগণ চারিদিকে চায়।
অমৃতের বন * দেখে কিছু নাহি তায়॥
নানাস্ত্র ঝগড়া শেল মুষল মুদ্গর।
বহু অস্ত্র মারে তারা হনুর উপর॥
নানা অস্ত্র রাক্ষসেরা ফেলে অতি কোপে।
লাফে লাফে হনুমান সব অস্ত্র লোফে॥
কুপিলেন হনুমান পবন-নন্দন।
সবার উপরে করে গাছ বরিষণ॥
গাছ লৈয়া হনুমান যায় তাড়াতাড়ি।
গাছের বাড়িতে মারে দশ বিশ কুড়ি॥
হনুমান যুঝে যেন মদমত্ত হাতী।
কারে মারে চাপড় কাহারে মারে লাথি॥
দশ বিশ চেড়ী ধরি মারিছে আছাড়।
মাথার খুলি ভাঙ্গে কার চূর্ণ করে হাড়॥
প্রাণ লৈয়া কত চেড়ী পলাইল ত্রাসে।
সীতারে জিজ্ঞাসে বার্ত্তা অতি ঘন শ্বাসে॥

* আমের বন

রাজবাড়ীতে যত প্রহরী ছিল, সকলকে সে চড় মারিয়াই শেষ করিয়া ফেলিল। ইহা শুনিয়া রাবণ নিজের ছেলে অক্ষকে যুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন।

হনুমান অক্ষের পা ধরিয়া ছুঁড়িয়া শূন্যে পাঠাইয়া দিল—তাহার রথখানাকে গুঁড়া করিয়া ফেলিল এবং রথের আটটা ঘোড়াকে পিঁপড়ার মত ধরিয়া মারিল।

সে-কাণ্ড চোখে দেখিলেও বিশ্বাস করা যায় না। মোটে একটা বানর! সে এই এত বড় লঙ্কাটার এই হাল করিল? রাবণ তাঁহার বড় ছেলে ইন্দ্রজিৎকে পাঠাইলেন। ইন্দ্রজিৎ ভয়ানক বীর। দেবতারাও তাঁহাকে ভয় করেন। ইন্দ্রজিৎ বানর মারিতে আসিলেন।

বানর অনেকক্ষণ লড়িল, তারপর পারিল না। ইন্দ্রজিতের এক বাণে সে আটক পড়িয়া গেল।

তখন তাহাকে ধরাধরি করিয়া রাজসভায় রাজার সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইল।

রাবণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? কি চাও? কেনই বা এরকম উপদ্রব করিলে?

হনুমান বলিল, আমি কিষ্কিন্ধ্যার রাজার দূত—রামচন্দ্রের সেবক। তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলাম। তোমার প্রহরীরা দেখা করিতে দেয় নাই, তাই তাহাদের মারিয়া দেখা করিতে যাইতেছিলাম।

আমার সঙ্গে তোমার কি দরকার?

তুমি শ্রীরামের স্ত্রী সীতাকে চুরি করিয়া আনিয়াছ। ভালয় ভালয় তাঁহাকে আমার সঙ্গে ফিরাইয়া দাও, নতুবা তুমি মরিবে!

আমি মরিব—বটে! তবে তুই-ই মর!

রাবণ হুকুম দিলেন—এই বানরকে এখনি কাটিয়া ফেলা হউক।

রাবণের ছোট ভাই বিভীষণ চিরদিনই ধর্ম্মভীরু লোক। তিনি বলিলেন,

দাদা, দূতকে বধ করা অনুচিত—দূত চিরদিন অবধ্য। ইহাকে অন্য দণ্ড দিন।

দূত অবধ্য! এ-কথাটা রাবণ জানিতেন। বলিলেন, ভাল! বধ করিয়া কাজ নাই। ইহার লেজে আগুন ধরাইয়া ছাড়িয়া দাও। মরে আগুনে পুড়িয়া নিজে মরুক—বাঁচে বাঁচুক, ক্ষতি নাই।

—দাও আগুন!

হায়রে! এই আদেশ যে রাবণেরই সর্ব্বনাশের কারণ হইবে, তাহা কে জানিত!

গাদায় গাদায় কাপড় আসিল, পিপে-ভরা তেল আসিল। দিস্তা দিস্তা কাপড় ছিঁড়িয়া লেজে জড়াইয়া তেল ঢালা হইতে লাগিল। মোটা সোটা লেজটি হাতীর শুঁড়ের মত হইয়া উঠিল; তেল জব জব করিতেছে, রাক্ষসেরা তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল। আগুন দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিল। লেজে দাউ দাউ করিয়া আগুন জলিতেছে, সেই অবস্থায় রাক্ষসেরা তাহাকে ধরাধরি করিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিল।

আর হনুমানকে পায় কে? রামচন্দ্রের নাম করিয়া, দিল সে এক লাফ! লাফে লাফে লঙ্কার গৃহস্থদের ঘরের চালে চালে ঘুরিয়া লঙ্কাময় সে আগুন ছড়াইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে সারা লঙ্কা অগ্নিময় হইয়া উঠিল। লঙ্কাবাসী হায় হায় করিয়া বুক চাপড়াইতে লাগিল।

কোথাও আগুন ধরিলে মেয়েরা বলিয়া থাকে—লঙ্কাকাণ্ড হইয়া গেল। হনুমান যে কাণ্ডটি করিয়াছিল, তাহা হইতেই 'লঙ্কাকাণ্ড' কথার উৎপত্তি।

দেখ দেখ, ধর ধর, মার মার—করিতে করিতে রাক্ষসেরা যত তাড়া করে, হনুমান ততই এ-ঘরের চাল হইতে সে-ঘরের চালে লাফাইয়া যায়… যেখানে আগুন ছিল না, সেখানেও আগুন জলিয়া উঠে। দেখিতে দেখিতে অশোক-বনের দিকেও আগুন ছুটিল; এইবার হনুমান ভয় পাইয়া গেল।

দেবী যে অশোক-বনে আবদ্ধ রহিয়াছেন! সেইখানে আগুন গেলে দেবীকে কে রক্ষা করিবে? দেবী যে মারা পড়িবেন। হায় হায়! সে এ কি করিল! হনুমান দু' হাতে নিজের গালে-মুখে চড়াইতে লাগিল!

যদি কোন উপায় করিতে পারে ভাবিয়া হনুমান অশোক-বনের দিকেই চলিল। কিয়দ্দূর গিয়া দেখিল, সেদিকের আগুন আপনা হইতেই নিভিয়া গিয়াছে। তখন সে একটা উঁচু পাহাড়ের দিকে ছুটিল। সেই পাহাড় হইতে লাফ মারিয়া ওপারে পড়িবে—এই তার ইচ্ছা।

এবার যদিও সীতার দেখা পাওয়ায় তাহার মন খুব প্রফুল্ল ও উৎসাহ-পূর্ণ ছিল, কিন্তু শরীরটা বড়ই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু রামচন্দ্র তাহার আশাপথ চাহিয়া আছেন। সে যাইলে তবে সীতা উদ্ধারের পরামর্শ হইবে! হনুমান আর বিলম্ব করিতে পারিল না। জয় রামচন্দ্র!—বলিয়া আবার দিল সে লম্ফ! একেবারে ওপারে যাইয়া হনুমান উপস্থিত।

জাম্বুবান ও অন্যান্য বানরগণ তাহার মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া, আর তাহার শরীরটা ক্লান্ত অনুমান করিয়া তাহাকে কাঁধে তুলিয়া লইল। সে নামিবার বহু চেষ্টা করিল, কিছুতেই তাহাকে তাহারা নামিতে দিল না। একেবারে রামচন্দ্রের সম্মুখে আনিয়া ঝপাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল।

হনুমান রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া সমস্ত বিবরণ বলিল এবং দেবীর মাথার মণিটি দিল। রামচন্দ্র সেটিকে বুকে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

———

লঙ্কাকাণ্ড

রাবণ এতদিনে বুঝিলেন, আর নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় নাই। হনুমান যখন সীতাকে দেখিয়া গিয়াছে, তখন রাম ও লক্ষ্মণ নিশ্চয়ই এবার সীতাকে উদ্ধার করিতে আসিবেন। কিন্তু সীতাকে তিনি তাঁহাদের হাতে ফিরাইয়া দিতে রাজী ছিলেন না। যাহারা তাঁহার ভগ্নীকে মারিয়াছে, নাক-কান কাটিয়াছে, তাঁহাদের ঘরের একটা মেয়েকে যখন এত কষ্ট করিয়া আনাই হইয়াছে, তখন ফিরাইয়া দেওয়া আর যায় না। ফিরাইয়া দিলে বড়ই ছোট হইতে হয়। তাহাতে মানে বড় ঘা লাগিবে।

রাবণ তাঁহার সভাসদদের ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজার মতেই তাহাদের মত; সীতাকে ফিরাইয়া দিলে মাথা কাটা যায় অপমানে। রাক্ষস হইয়া, লঙ্কার রাজা হইয়া, এতখানি অপমান কি সহ্য হয়! আসুক সেই মানুষ দুইটা আর হনুমানের দল; আমরা তাহাদের ভয় করি না।

কুম্ভকর্ণ তখন দুইদিনের জন্য জাগিয়াছিলেন, তাঁহাকে মত জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, তুমি যখন দিগ্বিজয়ে বাহির হইতে তখন আমি তোমায় বাধা দিতাম না, কারণ তাহা বীরের ধর্ম্ম। কিন্তু এ-কার্য্য আমার জ্ঞাতসারে হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে ইহা করিতে দিতাম না! কারণ স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীকে হরণ করা, বিশেষতঃ যে কোনও উপায়েই হউক স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করা যৎপরোনাস্তি কাপুরুষের কার্য্য, অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য! ইহার শাস্তি তোমাকে ভোগ করিতেই হইবে। যাহা হউক, যখন নির্ব্বোধের মত কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছ, তখন ত আর কোন উপায় নাই—এখন রক্ষবংশের মান-রক্ষা করিতেই হইবে। যুদ্ধই কর। প্রয়োজন হইলে আমাকে বলিও, আমি একাই তাহাদের সকলকে শেষ করিয়া দিব।

কিন্তু রাবণের ছোট ভাই বিভীষণ ধার্ম্মিক লোক। তিনি বলিলেন—দাদা, সীতাকে চুরি করিয়া আনা আমাদের অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে।

রাবণ বলিলেন—রাম-সীতা সূর্পনখাকে কষ্ট দিল কেন?

বিভীষণ বলিলেন—সে-কার্য্যের জন্যও তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না; সূর্পনখা তাঁহাদিগকে জ্বালাতন করিতে না গেলে, তাঁহারা কিছুই করিতেন না। এখন আমার মনে হয়, রাম ও লক্ষ্মণ লঙ্কায় আসিবামাত্র সীতাকে তাঁহাদের হাতে দেওয়া ছাড়া আমাদের অন্য কিছুই করিবার নাই। তাহা ছাড়া, রাম-লক্ষ্মণ সামান্য মানুষ নহেন! মনে আছে ত তাঁহাদের সেই দূতটিকে? সে একা আসিয়াই লঙ্কা অর্দ্ধ-ধ্বংস করিয়া দিয়া গিয়াছিল।

ইহাতে রাবণের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সব রাগিয়া উঠিল; যাহার যাহা মুখে আসিল বিভীষণকে তাহাই বলিয়া ব্যঙ্গ করিল। বিভীষণ কাপুরুষ, নর-বানরদের নামে সে ভয় পাইয়াছে—এই সব!

রাবণ বলিলেন—তোমার কি তবে এই ইচ্ছা যে, আমি লোকের কাছে অপদস্থ হইয়া, রাম, লক্ষ্মণ আর বানরদের কাছে মাথা নীচু করিয়া থাকি? তুমি ত আমার খুব ভাল ভাই দেখিতেছি!

ইন্দ্রজিৎ রাবণের ছেলে, বীর; তিনি বলিলেন—খুড়া মহাশয় আপনাকে জন-সমাজে ছোট করিয়া দিতে পারিলেই বাঁচেন।

রাবণ সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন—অমন ভাই থাকার চেয়ে না থাকা ভাল; দূর হ, দূর হ, আর তুই আমার সামনে আসিস না। বিভীষণ আরও একবার তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, রাম-লক্ষ্মণ যে সহজ নহেন, তাহা খরদূষণ প্রভৃতি সূর্পনখার রক্ষকদের মৃত্যু, হরধনু ভঙ্গ, তাড়কা-বধ প্রভৃতিতেই কি প্রমাণ হইয়া যায় নাই? তাহা ছাড়া রামের অনুচর সামান্য এক বানরকেই কি কেহ আটকাইতে পারিল? রামচন্দ্র যখন সদলবলে আসিবেন, তখন কি অবস্থা হইবে?

কিন্তু এই সব সদ্যুক্তিতে কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, রাবণ রাগিয়া আগুন হইলেন; বিভীষণকে কটুভাষায় গালি দিতে লাগিলেন। তখন বিভীষণ তাঁহার পায়ে ধরিতে গেলেন কিন্তু ফল হইল উল্টা—রাবণ বিভীষণকে পদাঘাত করিলেন।

বিভীষণ তখনি নিজের অনুগত লোকজন লইয়া রাবণের সভা ত্যাগ করিলেন; কিন্তু কোথায় যাইবেন স্থির করিতে পারিলেন না। অধর্ম্ম-প্লাবিত লঙ্কায় থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই। বিভীষণ তখন মায়াবলে আকাশ-পথে গিয়া রামের শরণাপন্ন হইলেন। রাম তাঁহাকে আদর করিয়া বুকে টানিয়া লইলেন।

সমস্ত কথা শুনিয়া রামচন্দ্র কহিলেন, কোন ভয় নাই। রাবণের নিজের পাপে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। আমি তোমাকেই তাহার পরিবর্ত্তে লঙ্কার রাজা করিব। এস, আজই তোমার অভিষেক শেষ করিয়া দিই।

তখনই সমুদ্রের জল আনিয়া রামচন্দ্র নিজে তাঁহাকে লঙ্কার রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল। আকাশ-পথে দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

অনেকে এই ব্যাপারে বিভীষণের উপর দোষারোপ করেন; ঘরভেদী বিভীষণ বলিয়া গালি দেন। তাহারা বলেন যে, বিভীষণ রামকে ঘরের খবর না দিলে রাবণের মৃত্যু হইত না। রাবণ যাহাই করুক, তাহার শত্রুপক্ষে যোগ দেওয়া বিভীষণের উচিত হয় নাই।

কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বোঝা যায় যে, অধর্ম্মাচারী রাবণের অন্যায় বিভীষণ বহুদিন ধরিয়া সহিতেছিলেন। তাহার উপর সদ্যুক্তির পরিবর্ত্তে পদাঘাত লাভ করিয়াও কি বিভীষণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর কোন কর্ত্তব্য ছিল? রাবণের নিজের অসংযম, দম্ভ ও ক্রোধের জন্যই তাঁহার পতন হইল। বিভীষণ নিমিত্ত মাত্র!

এ সম্বন্ধে আমাদের বাঙালী কবি বলিয়াছেন—

"পার হয়ে এল প্রবল বৈরী সাগরে জাঙ্গাল বাঁধি
লঙ্কার দশা ভাবিয়া পড়িনু ভাইয়ের চরণে কাঁদি
মরণ দম্ভে মাতি'
সবার সুমুখে সভায় বসিয়া সে ভাই মারিল লাথি!
আমি তাহা সহি নাই ;—
তোমরা কি চাও, খৃষ্ট নিতাই হবে রাবণের ভাই?

*　　*　　*

দুর্দ্দিনে শুধু আশ্রয় নহে, মিতা বলে কোল দিল,
সমর সাগরে অপরিচিতের তরণী সমর্পিল!
সেই পুরুষোত্তমে
দেখনি তোমরা, তাই ভাব আমি পড়েছিনু মহাভ্রমে!
ঘরের খবর রঘুবরে যদি সব কয়ে দিয়ে থাকি—
মোরে দুষ বৃথা, দেখনি তোমরা সে দুটি কমল আঁখি!"

(যতীন্দ্র সেনগুপ্ত)

যে সময় বিভীষণ কাছে আসিলেন, তখন রামচন্দ্র তাঁহার বানর-সৈন্য লইয়া, সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন।

কিন্তু উত্তাল সমুদ্র! কথিত আছে, কিছুতেই কিছু করা যায় না দেখিয়া রামচন্দ্র সমুদ্রের পূজা করিলেন ; তাহাতেও কিছু হইল না দেখিয়া তিনি অস্ত্র-প্রয়োগে সমুদ্রকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন সমুদ্র দেখা দিয়া বলিলেন, আপনি সেতু নির্ম্মাণ করিয়া চলিয়া যান। আপনি ফিরিয়া না আসা

পর্য্যন্ত আমি শান্ত হইয়া থাকিব। কিন্তু ফিরিবার সময় আপনি সেতুটি ভাঙ্গিয়া দিবেন।

যাহা হউক—নল নামক সুগ্রীবের যন্ত্রবিদ্ পাথর ও গাছ দিয়া সাগরের উপর সেতু বাঁধিলেন। বিপুল বানর-কটকসহ রামচন্দ্র সেতুর উপর দিয়া লঙ্কার দ্বার-পথে পৌছিলেন।

রাবণের গুপ্তচরেরা সেই বাহিনী দেখিয়া গিয়া সভয়ে বলিল—মহারাজ, রামের সৈন্য-সংখ্যা আর সমুদ্র-সৈকতের বালু-কণার সংখ্যা সমান—গণিতে পারি নাই।

তাইত! রাবণ প্রমাদ গণিলেন, তবে কি সীতাকে ফিরাইয়া দিতেই হইবে? না, রাবণ অন্য উপায় স্থির করিলেন। এই সময় যদি তিনি সীতাকে ছলে-বশ করিয়া ফেলিতে পারেন, তবে কোন ক্ষতিই হইবে না, রাবণও যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে সসম্মানে অব্যাহতি পইবেন। তিনি বুদ্ধি করিয়া রামের একটা মুণ্ড তৈয়ারী করিয়া, আর যে রকম ধনুর্ব্বাণ রাম ব্যবহার করেন, সেইরূপ একটা ধনুর্ব্বাণ লইয়া সীতার নিকট গিয়া বলিলেন—সীতা, আজিকার যুদ্ধে রাম মারা পড়িয়াছে; এই দেখ তার মুণ্ড আর ধনু! কাঁদিয়া আর কি লাভ বল? কাঁদিলে ত আর রামকে ফিরিয়া পাইবে না—তার চেয়ে বরং আমার রাণী হইয়া, লঙ্কার অধীশ্বরী হইয়া থাক!

সীতা এখানে একটি সমবয়সী বন্ধু পাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম, সরমা—তিনি বিভীষণের পত্নী। বিভীষণ সরমাকে সীতার কাছে কাছে থাকিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন। তাই সীতার কাছে সরমা সর্ব্বক্ষণ থাকেন। তিনি রাবণের ছল বুঝিতে পারিয়া, চোখ টিপিয়া ইশারা করিয়া দিলেন। সীতা বুঝিলেন, রাবণ মিথ্যা করিয়া রামের মুণ্ড আনিয়াছেন, সীতা শান্ত হইলেন।

তারপর ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সে-কথা সবিস্তারে আমি এখানে

লিখিব না; লিখিতে পারিবও না। মূল রামায়ণে সকলকে সে কাহিনী পড়িতে বলি; রামায়ণের-যুদ্ধ বর্ণনা পড়িতে পড়িতে যুদ্ধ-সৈনিকের মত সকলের হৃদয়ই সে ছন্দের তালে তালে নাচিয়া উঠিবে।

যুদ্ধে লঙ্কার বড়-ছোট বীর প্রায় সব শেষ!

রাবণ সকলের চেয়ে যাঁহার আশা বেশী করিতেন, যাঁহার তুল্য বীর ছিল না, দেবতারাও যাঁহার দাপে কাঁপিতেন, রাবণের বড় ছেলে সেই ইন্দ্রজিৎ—তিনিও মরিলেন। ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে জয়-লাভের আশায় নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে পূজা আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিভীষণ রামচন্দ্রকে বলিলেন, এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া বাহির হইলে ইন্দ্রজিৎকে কেহ পরাজিত করিতে পারিবে না—দেবী ভবানীর বরে সে অজেয় হইয়া উঠিবে।

রামচন্দ্র বলিলেন, কিন্তু প্রাসাদের মধ্যে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার, সেখানে কেমন করিয়া যাওয়া যাইবে!

বিভীষণ বলিলেন, আমার নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র—কথাটা মনে করিলেও বুক ফাটিয়া যায়—কিন্তু ধর্ম্মের দিক চাহিয়া নির্ম্মম হইতেই হইবে। আমি গুপ্ত-পথ দিয়া লইয়া যাইব। লক্ষ্মণ আমার সঙ্গে চলুন।

তাহাই হইল। বিভীষণের সঙ্গে গুপ্তপথে লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিয়া পূজায় নিরত মেঘনাদকে বধ করিলেন। রাবণের চক্ষে দশদিক অন্ধকার হইয়া গেল। এতক্ষণ এত বিপদের মধ্যেও রাবণ খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, ইন্দ্রজিতের মৃত্যু যেন তাঁহার পিঠের শিরদাঁড়া ভাঙ্গিয়া দিল; রাবণ পড়িয়া গেলেন।

রাবণের এ-সময়ের মনের অবস্থা বলা দায়! তাহার রাজ্য গিয়াছে, ছেলে গিয়াছে, ভাই কুম্ভকর্ণ পর্য্যন্ত গিয়াছে। অকালে নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহাকেও যুদ্ধে পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু তিনিও অসীম বীরত্বে বহু বানর-সৈন্য মারিয়া অবশেষে নিজে মরিলেন। আছে নিজের আর পুরনারীদের প্রাণগুলি!



নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিৎ

রামায়ণ—পৃঃ ১০২

মহাকবি মধুসূদন দত্তের "মেঘনাদ-বধ কাব্যে" এই স্থানের একটি চমৎকার বর্ণনা আছে। রাবণ দুঃখ করিতেছেন :—

ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে!—
সঁপি রাজ্য ভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে!
তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে।
ছিল আশা রক্ষ-কুল রাজ-সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে;
বামে রক্ষঃ কুললক্ষ্মী যক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ! বৃথা আশা! পূর্ব্ব জন্ম-ফলে,
হেরি তোমা-দোঁহে আজি এ কাল-আসনে!
কর্ব্বুর গৌরব-রবি চির-রাহু-গ্রাসে!
সেবিনু শিবিরে আমি বহু যত্ন করি;
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,—
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর? কি সান্ত্বনা ছলে
সান্ত্বিব মায়ে তব, কে কবে আমারে?
'কোথা পুত্র, পুত্রবধূ আমার?' সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী—'কি সুখে আসিলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে রক্ষকুল-পতি?—'
কি কয়ে বুঝাব তারে? হায় রে, কি কয়ে?
হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী রণে!

হা মাতঃ রাক্ষস-লক্ষ্মি! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?

ইন্দ্রজিতের পত্নী প্রমীলা স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গিয়াছেন। তাই রাবণ পুত্র ও পুত্রবধূকে সম্বোধন করিয়া বিলাপ করিতেছেন।

মেঘনাদের মৃত্যুতে ক্ষিপ্ত হইয়া রাবণ তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক অস্ত্র শক্তিশেল-প্রয়োগে লক্ষ্মণের প্রায় প্রাণ-বিয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বানরদের কবিরাজ সুষেণের কথামত সেই রাত্রেই হনুমান বিশল্যকরণী ঔষধ আনিয়া মুমূর্ষু লক্ষ্মণকে বাঁচাইয়া দিলেন। কথিত আছে, বিশল্যকরণী গন্ধমাদন পর্ব্বতে আছে—সুষেণ এইটুকু শুধু বলিয়াছিলেন। হনুমান ঔষধ খুঁজিয়া না পাইয়া, রাতারাতি গন্ধমাদন পাহাড়টি আনিয়া হাজির করিয়াছিল।

রাবণ লক্ষ্মণকে মারিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া উল্লাস করিতেছিলেন—পুনরায় বানর-কটকের মধ্যে হর্ষধ্বনি উঠিতে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন।

তারপর রাম-রাবণের যুদ্ধ হইল। রাবণের পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছিল—রাবণ এই যুদ্ধেই মারাত্মকভাবে আহত হইলেন।

রাবণ ভক্ত ছিলেন, তপস্যা দ্বারাই তিনি অসীম শক্তি লাভ করিয়াছিলেন—শ্রীরামচন্দ্র তাহা জানিতেন। তিনি মৃত্যুর মুখে অগ্রসর এই ভক্ত সাধককে একবার শেষ দেখা দিতে চলিলেন।

রাম আসিয়া রাবণের নিকট রাজনীতি শিখিতে চাহিলেন।

কবি কৃত্তিবাস এই স্থানের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:

"উঠিতে শকতি নাই রাজা দশাননে।
ভক্তি ভাবে প্রণাম করিল মনে মনে॥
আঘাতে আকুল অঙ্গ বাক্য নাহি সরে।
বিনয় করিয়া কথা কহে ধীরে ধীরে॥

রামের সর্ব্বাঙ্গ রাজা করে নিরীক্ষণ।
সাক্ষাৎ বিরাট মূর্ত্তি ব্রহ্ম সনাতন॥
মায়াতে মানব দেহ বিশ্বময় তুমি।
তোমার মহিমা প্রভু কি জানিব আমি॥
অনাথের নাথ তুমি পতিত-পাবন।
দয়া করে মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ॥
চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার।
শাপেতে রাক্ষস কুলে জনম আমার॥
রাজনীতি তোমারে কি কব রঘুবর।
সংসারেতে যত নীতি তোমার গোচর॥
রাম বলে যে কহিলে সকল প্রমাণ।
তথাপি শুনিতে হয় আছয়ে বিধান॥
প্রাচীন ভূপতি তুমি অতি বিচক্ষণ।
বাহুবলে জিনেছ সকল ত্রিভুবন॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম রাজকর্ম্ম তোমাতে বিদিত।
তব মুখে শুনিব কিঞ্চিৎ রাজ নীত॥
দশানন বলে মম সংশয় জীবন।
কহিতে বদনে নাহি নিঃসরে বচন॥
যতক্ষণ বাঁচি প্রাণে আছি সচেতন।
কহিব কিঞ্চিৎ নীতি করহ শ্রবণ॥
করিতে উত্তম কর্ম্ম বাঞ্ছা যবে হবে।
আলস্য ত্যজিয়া তাহা তখনি করিবে॥
আলস্য রাখিলে কর্ম্ম পুনঃ হওয়া ভার।
কহি শুন রঘুনাথ প্রমাণ তাহার॥

এক দিন আসি আমি স্বর্গপুর হৈতে।
যমপুরী দৃষ্ট হৈল থাকি নিজ রথে ॥
শূন্য হৈতে দেখিলাম যমের ভুবন।
তিন দ্বারে নানা স্থানে আছে সাধুগণ ॥
দেখিলাম দক্ষিণেতে পাতকীর থানা।
দিবা কিম্বা রাত্রি কিছু নাহি যায় জানা ॥
অন্ধকারে চৌরাশীটা নরকের কুণ্ড।
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড ॥
পরিত্রাহি ডাকে পাপী বিষম প্রহারে।
না দেয় তুলিতে মাথা যমদূতে মারে ॥
তাহা দেখি বড় দয়া হইল মনেতে।
ঘুচাব পাপীর দুঃখ শমনের হাতে ॥
পাপীর দুর্গতি আর দেখা নাহি যায়।
এত ভাবি সেইদিন এলেম লঙ্কায় ॥
পূরাব নরক-কুণ্ড নিত্য করি মনে।
আজি কালি করিয়া রহিল বহুদিনে ॥
হেলায় রহিল পড়ে না হৈল পূরণ।
তারপর তব সঙ্গে বাজিল এ রণ ॥
এক কথা কহি রাম দেখ বিদ্যমান।
সূর্পনখার লক্ষ্মণ কাটিল নাক কাণ ॥
সেই এসে উপদেশ কহিল আমারে।
তাহার বুদ্ধিতে আমি সীতা আনি হরে ॥
একবার ভাবিলাম আপন মনেতে।
আজি নহে কালি সীতা আনিব পশ্চাতে ॥

আবার বিচার করি দেখিলাম ভেবে।
হেলায় রাখিলে পাছে আনা নাহি হবে॥
অতএব শীঘ্র যাই সীতার হরণে।
সর্ব্বনাশ হৈল আমার সীতার কারণে॥
এক লক্ষ পুত্র মোর সওয়া লক্ষ নাতি।
আপনি মরিনু শেষে লঙ্কা-অধিপতি॥
যদি সীতা আনিতাম ভেবে চিন্তে মনে।
তবে কেন সবংশে মরিব তব বাণে॥
হেলাতে না হরি সীতা রাখিতাম ফেলে।
তবে মোর সংহার না হৈত কোন কালে॥
এইমত রাবণ কহিল নীতি কথা।
কহিতে কহিতে হৈল জিহ্বার জড়তা॥

হনুমান ছুটিতে ছুটিতে অশোক-বনে গিয়া, সীতার পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া পড়িয়া বলিল—মা! রাবণ মরিয়াছে, আমরা যুদ্ধে জয়ী হইয়াছি।

সীতা হনুমানকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কিন্তু রাম কৈ? তিনি এখনও আসিতেছেন না কেন? সীতা যে তাঁহার পথ চাহিয়া আছেন—কৈ, তিনি কৈ?

হনুমান সীতার মনের ভাব বুঝিয়া রামের সন্ধানে চলিয়া গেল।

কতকাল পরে—কতকাল পরে!

সীতা মনে মনে কত সুখেরই কল্পনা করিতে লাগিলেন। ঐ যে প্রভু আসিতেছেন! ঐ যে! আহা, কত জীর্ণ হইয়া গিয়াছেন! কত কষ্টই হইয়াছে! দাসী কাছে ছিল না, কে সেবা করিয়াছে? কে প্রভুর সামনে বসিয়া খাওয়াইয়াছে? নিদ্রার পূর্ব্বে কে ব্যজন করিয়াছে?—সীতার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিয়া পড়িল।

আবার কত সুখ-চিন্তা! আর প্রভুর কোন কষ্ট হইবে না; দাসী প্রাণ দিয়া তাঁহার সেবা করিবে!

কিন্তু হায়! একি! এত কাল পরে রাম আসিলেন—এত গম্ভীর কেন? এত বিমর্ষ কেন? এত মলিন কেন?

সীতা ঝড়ের মুখে কলাপাতার মত কাঁপিতে লাগিলেন।

রাম বলিলেন—সীতা, আমি তোমাকে রাক্ষসপুরী হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছি, এখন তুমি তোমার ইচ্ছামত যেখানে খুশী যাইতে পার। এত কাল তুমি রাক্ষসের বাড়ীতে বাস করিয়াছ, তোমাকে আমি আর গ্রহণ করিতে পারি না।

সীতা রামের মুখে এ-কথা শুনিয়া তখনই মৃত্যু-কামনা করিলেন। কোন কথা নহে—মৃত্যু, মৃত্যুই তাঁহাকে শান্তি দিতে পারে। সীতা লক্ষ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন—লক্ষ্মণ, অগ্নি প্রস্তুত কর, এখনি তাহাতে ঝাঁপ দিয়া এ ছার জীবন বিসর্জ্জন দিব।

লক্ষ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে আগুন সাজাইয়া দিলেন। সীতা কিন্তু তখনও রামকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—জন্মে জন্মে যেন আমি তোমার স্ত্রী হইবার সৌভাগ্য লাভ করি, এই আশীর্ব্বাদ কর। তারপর তিনি দেবর লক্ষ্মণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সেই আগুনে ঝাঁপ দিলেন।

রাম-লক্ষ্মণ সে ভয়াবহ দৃশ্য দেখিতে পারিবেন না বলিয়াই চক্ষে কাপড় দিয়াছিলেন। হঠাৎ কে যেন ডাকিল—রাম!

রাম চক্ষু খুলিতেই দেখেন, স্বয়ং অগ্নি সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া আগুনের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! সীতার গায়ে আগুনের একটি আঁচও লাগে নাই—সীতার কাপড়খানিও যেমন ছিল, তেমনই রহিয়াছে।

অগ্নিদেব বলিলেন—রাম, সীতা সতী-লক্ষ্মী, তাঁহার দেহে বা মনে

এতটুকু পাপও প্রবেশ করে নাই। সীতাকে যদি পাপ স্পর্শ করিত, তবে অগ্নির গ্রাস হইতে তিনি এমন অক্ষত দেহে কখনই ফিরিয়া আসিতে পারিতেন না। তুমি ইহাকে স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ করিতে পার।

অগ্নিদেবের কথা শুনিয়া রামের মনে আর কোন দ্বিধা রহিল না। তিনি আদর করিয়া সীতার হাত ধরিলেন। বলিলেন, সীতাকে ঘরে লইতে আমার যে আপত্তি ছিল, সে শুধু লোকলজ্জার। এক্ষণে দেবতার আদেশে তাঁহাকে পাইলাম, আর দুঃখ রহিল না। দুঃখিনী সীতা রামচন্দ্রের আদরে ক্ষুদ্র বালিকার মত আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বড় ভাইয়ের স্ত্রী আর সীতার স্বভাবের গুণে লক্ষ্মণ সীতাকে মায়ের মত ভক্তি করিতেন; ভগিনীর মত ভাল বাসিতেন। রাম-সীতার মিলনে তাঁহার আনন্দই হইল সকলের চেয়ে বেশী।

রাম লঙ্কায় রাবণের শূন্য সিংহাসনে বিভীষণকে বসাইলেন।

তারপর রাম-লক্ষ্মণ বিভীষণ ও সুগ্রীবের কাছে বিদায় লইলেন; চৌদ্দবৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, এখন অযোধ্যায় ফিরিতে হইবে। মায়েরা আকুল-দৃষ্টিতে পথের পানে চাহিয়া আছেন; ভায়েরা দিন গণিতেছেন; বধূরা, রাজ্যের প্রজারা—সকলেই তাঁহাদের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছে। মন অত্যন্ত উচাটন হইয়া রহিয়াছে—আর ত দেরী করিতে পারা যায় না। সীতা বিভীষণের স্ত্রী সরমার কাছে বিদায় চাহিলেন। রাবণের অশোক-বনে সীতা কেবল এই সরমার ভালবাসাটুকু পাইয়াছিলেন বলিয়াই প্রাণে বাঁচিয়াছিলেন। সরমা তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন; সীতাও সরমাকে ভালবাসিয়াছিলেন। বিদায়কালে উভয়ের চক্ষু হইতে জল গড়াইয়া পড়িল।

সরমা সীতার গলা জড়াইয়া বলিলেন, বোন, তোমরাই আমাকে আজ

রাজার রাণী করিয়াছ! ভগবান করুন, অযোধ্যায় ফিরিয়া তুমি রামচন্দ্রের বামে রাজ-সিংহাসনে বসিয়া সুখে রাজ্য কর।

তারপর সকলে আকাশ-পথে রাবণের পুষ্পরথে চাপিয়া অযোধ্যায় ফিরিলেন। চৌদ্দ বৎসরের সেদিন শেষ দিন, ভরত ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া বসিয়াছিলেন এবং রামের দর্শন না পাইলে মৃত্যুকেই বরণ করিবেন প্রতিজ্ঞা করিতেছিলেন। অযোধ্যায় যে আনন্দ উৎসব হইল, তাহার বর্ণনা করা যায় না। চিরান্ধ ব্যক্তি হঠাৎ যদি কোন প্রভাতে চক্ষের পল্লব মেলিয়াই জগৎ-সংসার সব দেখিতে পায়, তবে তাহার যেমন আনন্দ হয়, রামচন্দ্রকে পাইয়া অযোধ্যাবাসীরও তেমনি আনন্দ হইল।

প্রজারা রামকে সিংহাসনে বসাইয়া, তাহাদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ করিল।



উত্তরাকাণ্ড

কিছুদিন খুব সুখেই গেল। সীতা গর্ভবতী হইলেন! রামচন্দ্রের পুত্র ও উত্তরাধিকারী হইবে—সকলেরই ইহাতে আনন্দ।

কিন্তু সহসা সুখের বাসরে তাঁহাদের আগুন লাগিল। রাজ্যে ভাল-মন্দ সব-রকমই লোক থাকে; অযোধ্যাতেও ছিল। কতকগুলো মন্দ লোক রটনা করিতে লাগিল যে, রাম বুদ্ধিমান লোক হইয়া, যে সীতা রাক্ষসপুরীতে অনেকদিন বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া ভাল কাজ করেন নাই। রামের গুপ্তচর এ-কথা রামকে আসিয়া জানাইল। রাম লঙ্কার সেই অগ্নি-পরীক্ষার কথা বলিলেন। গুপ্তচর বলিল—প্রজারা বলে, আমরা ত সে-সব দেখি নাই! সাধারণতঃ রাজা যাহা করেন, প্রজারা তাহারই অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। তিনি রাজা হইয়া যদি এমন করেন, তাহা হইলে আমাদের স্ত্রীদিগকে সামলান দায় হইবে।

রাম প্রাণের চেয়েও ভালবাসিতেন প্রজাদের—প্রজাদের হিতার্থে তিনি না করিতে পারেন, এমন কাজই ছিল না। প্রজারা তাঁহার আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়াছে, রামের বুকে এ-দুঃখ শেলের মত বাজিল। রাম সীতাকে ত্যাগ করিবেন স্থির করিলেন।

সীতা রাজ্য ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও তপোবনের শান্ত-স্নিগ্ধ দিনগুলির কথা ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল—একবার তপোবনে বেড়াইতে যাইবেন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সকল ব্যাপার বুঝাইয়া বলিয়া আদেশ করিলেন—সীতাকে তপোবনে লইয়া যাইবার নাম করিয়া, বাল্মীকির তপোবন-প্রান্তে রাখিয়া আইস।

সীতা মহোল্লাসে লক্ষ্মণের সঙ্গে তপোবন-ভ্রমণে চলিলেন। বাল্মীকির



বাল্মীকির আশ্রম-সমীপে পরিত্যক্তা সীতা

রামায়ণ—পৃঃ ১১৪

তপোবন-প্রান্তে আসিয়া লক্ষ্মণের অশ্রু আর বাধা মানিল না। তিনি সাশ্রুনয়নে প্রজারঞ্জনার্থ রাজা যে নিষ্ঠুর আদেশ দিয়াছেন, তাহা মাতা জানকীকে নিবেদন করিলেন। সীতা শোকাবেগে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন; শেষে জ্ঞান আসিলে তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "এ-জীবন আমি বিসর্জ্জনই করিতাম, কিন্তু রঘুবংশের কুলতিলককে আমি ধারণ করিয়া আছি, সুতরাং আত্মহত্যা করিব না। স্বামীর ইচ্ছাতেই আমি বনবাসী হইলাম। রামচন্দ্র আমাকে প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসেন। শুধু প্রজারঞ্জনের জন্যই আমাকে তিনি বনবাসে পাঠাইয়াছেন। আমি তাঁহার কোন দোষ দিই না। প্রার্থনা করি, যেন জন্ম জন্ম তাঁহাকেই আমি স্বামীরূপে পাই।"

বাল্মীকি তপোপ্রভাবে সবই জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি সীতাকে নিজের মেয়ের মত বুকে তুলিয়া লইলেন। সেইখানে থাকিতে থাকিতেই সীতার দুইটি (যমজ) পুত্র জন্মিলেন। বাল্মীকি তাঁহাদের নাম রাখিলেন—কুশ ও লব। তাঁহারা বাল্মীকির আশ্রমেই বড় হইতে লাগিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহাদিগকে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিলেন। অবসরকালে তাঁহাদিগকে রাম-চরিত্র অবলম্বনে কয়টি মধুর গানও শিখাইলেন। বালকেরা জানিতেন না যে, এ রাম কে? তবে রামের বীরত্ব ও ন্যায়নিষ্ঠার কথা শুনিতে তাঁহাদের খুব ভাল লাগিত, তাই তাঁহারা প্রায়ই রাম-নাম-গান করিতেন।

এইরূপে দিন যায়। খবর আসিল, রাম অযোধ্যায় অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিতেছেন। অশ্বমেধ-যজ্ঞ করার এই নিয়ম যে রাজাকে সস্ত্রীক যজ্ঞ করিতে হইত। রামের ত সীতা ছাড়া স্ত্রী নাই, তবে তিনি কাহাকে লইয়া যজ্ঞ করিতেছেন? তিনি কুশ-লব দুটি ভাইকে লইয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন।

মহর্ষি যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সিংহাসনের বাম দিকে সীতা! স্বর্ণ-সীতা! সীতার স্বর্ণ-মূর্ত্তি খোদিত করিয়া স্থাপিত হইয়াছে। মহর্ষি বড়ই আনন্দিত হইলেন।

যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, কুশ-লব দুটি ভাই বীণা বাজাইয়া গান আরম্ভ করিলেন। কবে রাম তাড়কা বধ করিয়াছিলেন; কবে পদধূলি দিয়া পাষাণে প্রাণদান করিয়াছিলেন; কবে জনক-রাজ-সভায় সকলকে হারাইয়া হরধনু-ভঙ্গ করিয়া জানকীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; কবে পিতার সত্য-রক্ষা করিতে হাসিমুখে বনে গিয়াছিলেন; কবে বনে জানকীকে হারাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন; কবে আবার লঙ্কা-ধ্বংস করিয়া জানকীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; কবে অগ্নিদেবের হাত হইতে সতী জানকীকে গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন; কবে তাঁহাকে লইয়া রাজসিংহাসনে বসিয়াছিলেন; আবার কবে প্রজাদের মনস্তুষ্টির জন্য গর্ভবতী জানকীকে বনে পাঠাইয়াছিলেন—নাচিয়া নাচিয়া মিষ্ট মধুর-স্বরে লব-কুশ তাহা গাহিয়া যাইতে লাগিলেন।

গানের মাঝেই রাম কখন যে জ্ঞান হারাইয়া পাথরের মত হইয়া গিয়াছিলেন, তাহা কেহই লক্ষ্য করে নাই! হঠাৎ কৌশল্যা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইতেই লোকের দৃষ্টি রামের উপর পড়িল।

গান থামিয়া গেল! রামের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। রাম আদর করিয়া ছেলে দুইটিকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন—তোমাদের নাম কি?

কুশ, লব!

তোমাদের পিতা কে?

তা আমরা জানি-না; আমরা দু'টি ভাই মায়ের ছেলে! আমাদের মা'র নাম—সীতা!

সীতা!—রাম ছেলে দু'টিকে বুকে চাপিয়া পড়িয়া গেলেন। সীতা! যাঁহাকে বিনা দোষে বনবাস দিয়াছেন, যাঁহাকে বনে দিয়া, সকাল-সন্ধ্যা,

দিন-রাত কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়াছেন—সীতা! সেই সীতার ছেলে দু'টি।

সীতার নাম কানে যাইতেই কৌশল্যারও মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া গেল। লব-কুশকে সীতার ছেলে শুনিয়া, তিনি সেই যে তাঁহাদের কোলে চাপিয়া ধরিলেন, আর ছাড়িলেন না।

মহর্ষি বাল্মীকি বলিলেন—নরপতি রামচন্দ্র, আমি সারা জীবন তপস্যা করিয়া কাটাইয়াছি—আমি মহর্ষি বাল্মীকি, আমি অনুরোধ করিতেছি, নিষ্পাপ সীতাকে তুমি গ্রহণ কর।

রাম প্রজাদের মুখের দিকে চাহিলেন; শব্দ উঠিল—এখনই, এখনই!

বাল্মীকি লক্ষ্মণকে স্বীয় তপোবনে পাঠাইয়া তখনই সীতাকে রাজসভায় আনয়ন করিলেন। রাম প্রজাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদের অনুমতি পাইলেই আমরা সীতাকে গ্রহণ করিতে পারি। বল, তোমাদের কি ইচ্ছা?

উত্তর আসিল, "মা জানকী আমাদের রাণী!"

কতকগুলা লোক কিন্তু কথা কহিল না; রাম-সীতা দু'জনেই তাহা দেখিলেন। সীতার প্রাণে বড় কষ্ট হইল। তিনি বসুমতীর মেয়ে, দুঃখের সময় তাঁহাকে স্মরণ করিলেন। সীতা ডাকিলেন—মা বসুমতি, তুমি দ্বিধা হও, আমি প্রবেশ করি। আমার আর এ-অপমান সহ্য হয় না।

বলিতে বলিতেই সীতার পায়ের নীচের ধরণী ফাঁক হইয়া গেল। সীতা তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সীতার মৃত্যুতে রামের প্রাণে যে আঘাত লাগিল তাহা প্রশমিত হইবার নয়। সীতার ছেলেরা মা-মা শব্দে মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন। বসুমতীর কাছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, তাঁহাদের দুঃখিনী মাকে ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। প্রজারা হায় হায় করিতে লাগিল। রাজ্য যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

রামের দুঃখের শেষ তখনো হয় নাই। কিছুদিন পরে সীতার মত লক্ষ্মণকেও পরিত্যাগ করিতে হইল। একবার কালপুরুষ রামের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া বলিলেন—আমি যতক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা কহি, কেহ যেন না আসে, এইরূপ আদেশ দাও। যদি কেহ আসে, তাহাকে বর্জ্জন করিতে হইবে!—রাম তাহাতে সম্মত হইলেন। লক্ষ্মণ দ্বার-রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঠিক সেই সময়ে ক্রোধপরায়ণ ঋষি দুর্ব্বাসা আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন, এখনই রামকে চাই, নতুবা শাপ দিয়া সমস্ত অযোধ্যাবাসীকে ভস্ম করিয়া ফেলিব।

লক্ষ্মণ দেখিলেন, নিজেকে রক্ষা করিতে গেলে নিরীহ প্রজারা মারা পড়ে। তার চেয়ে নিজে যাওয়া ভাল।

লক্ষ্মণ রামকে খবর দিলেন। কালপুরুষ চলিয়া গেলেন—দুর্ব্বাসাও কথা শেষ করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু রামের যে বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছে! লক্ষ্মণ যে প্রাণের প্রাণ! তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে—সে যে বড় ভয়ানক, বড় ভয়ানক।

লক্ষ্মণ সরযূর জলে নামিয়া ধ্যানস্থ হইলেন—সে-ধ্যান আর ভাঙ্গিল না।

রাম সীতা ও লক্ষ্মণ দুইজনকে হারাইয়া বেশী দিন বাঁচিলেন না। লব ও কুশের হাতে রাজ্যের ভার দিয়া, ভ্রাতা ও জননীগণ সহ সরযূর জলে প্রাণ-ত্যাগ করিলেন।

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরম্।
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকম্॥
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তিমূর্ত্তিম্।
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিম্॥

দক্ষিণে লক্ষ্মণে ধ্বনি বামতো জানকী শুভা।
পরতো মারুতির্যস্য তং নমামি রঘূত্তমম॥
রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥



রামায়ণী চরিত্র

রামায়ণের মোটামুটি গল্প এতক্ষণ বলিলাম। মূল বইটি পড়িলে দেখা যাইবে যে, আরও অনেক ভাল ভাল কথা তাহাতে লেখা আছে। আমাদের জাতীয় জীবনের সহিত রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে যে, আমাদের কাব্যে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে সর্ব্বত্রই ইহার প্রভাব দেখা যায়—এমন কি আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার মধ্যেও আমরা কতবার রামায়ণ-মহাভারতের কোন-না-কোন গল্পাংশ বা চরিত্রের উল্লেখ করি তাহা যদি লক্ষ্য করিয়া দেখি, তাহা হইলে বিস্মিত না হইয়া পারি না।

রামায়ণ বইটি কিন্তু মানুষেরই কাহিনী অবলম্বনে লেখা—সে-কথা এই বইয়ের আরম্ভেই বলিয়াছি। বাল্মীকি দেবতার কাহিনী লিখিতে চাহেন নাই, আদর্শ মানুষের ছবি আঁকিতে চাহিয়াছেন এবং সেই জন্যই তিনি বিশেষ করিয়া রাম-চরিত্র লইয়া তাঁহার মহাকাব্য রচনা করেন। মানুষ কিন্তু সাধারণ মানুষ নহে, মানুষ যতটা উপরে উঠিতে পারে, মনুষ্যত্ব দেবত্বের যতটা কাছাকাছি যাইতে পারে—তাহারই চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে এই মহাকাব্যটিতে। রামচন্দ্র ঈশ্বরের অবতার—এ-কথার আভাস রামায়ণে থাকিলেও, কবি কোথাও রাম চরিত্রে দেবত্ব আরোপ করেন নাই—বরং মানুষ যেমন হয়, সহজ ও স্বাভাবিক সুখ-দুঃখের অধীন, ঠিক তেমনি ভাবেই রামকে তিনি দেখাইয়াছেন। আর তাহাই দেখাইয়াছেন বলিয়াই আমরা আজ রামচন্দ্রকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেছি। মানুষের মধ্যে মহৎ গুণ দেখিলেই শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হয়—দেবতাদের সদ্‌গুণে বিস্মিত হইবার কি আছে?

শুধু রামচন্দ্র নহেন, রামায়ণের অন্য সব চরিত্রগুলিই মানুষ—নিতান্ত মানুষই! অসাধারণ হয়ত, কিন্তু অস্বাভাবিক নহে। কেমন করিয়া মানুষ প্রতিপন্ন করিয়াও ঋষি বাল্মীকি ঐ চরিত্রগুলিকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন, সে-কথাটা এইখানে তোমাদের বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

শ্রীরামচন্দ্র

রাম চরিত্র হইতেই শুরু করা যাক—কারণ রামচন্দ্রই এই গ্রন্থের নায়ক। তাঁহার কাহিনী পরিস্ফুট করিবার জন্য পাঠকদের সম্মুখে যাঁহাদের দাঁড় করানো দরকার, বাল্মীকি কেবলমাত্র সেই সব চরিত্রগুলিরই অবতারণা করিয়াছেন।

রামচন্দ্রের চরিত্রের অতি সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে এই গ্রন্থের প্রারম্ভে উদ্ধৃত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পংক্তিতে। এইবার সেই কথা-গুলি তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর সহিত মিলাইয়া লওয়া যাউক।

রাম দেখিতে যেমন সুশ্রী ও বিশাল-দেহ ছিলেন, তেমন সাহস ও বলও ছিল তাঁহার অসাধারণ। অথচ সমস্ত সত্ত্বেও তিনি যে বিনয়ের মূর্ত্ত অবতার ছিলেন, তাহারও পরিচয় পাই আমরা রামায়ণের ছত্রে-ছত্রে। মাত্র পঞ্চদশ বৎসর বয়সে যখন উগ্রতপস্বী বিশ্বামিত্র তাঁহাকে রাক্ষস-বধের জন্য লইতে আসিলেন তখন দশরথ ভয় পাইয়াছিলেন, কিন্তু পিতৃ-আজ্ঞা পাইবার পর রামচন্দ্র একবারও যাইতে ইতস্ততঃ করেন নাই। যে হর-ধনু পৃথিবীর কোন বীর তুলিতে মাত্র পারেন নাই, পঞ্চদশ বর্ষীয় কিশোর সেই হরধনুতে অনায়াসে জ্যা-রোপণ করিলেন। কিন্তু তবুও বিবাহের পর ফিরিবার সময় পথে যখন দুর্দ্ধর্ষ বীর ও ক্ষত্রিয়গণের মহাশত্রু পরশুরাম রামচন্দ্রের পথ-রোধ করিলেন, তখন প্রথম রামচন্দ্র তাঁহাকে বিনয়-বাক্যেই নিরস্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। অথচ তাই বলিয়া, পরশুরাম যখন কোনও কথা শুনিলেন না, তখন আর রামচন্দ্র দ্বিধা না করিয়া নির্ভয়ে শরাসন তুলিয়া লইলেন এবং পরশুরামের অন্যায় অত্যাচারের সমুচিত প্রতিফল দিলেন।

কিন্তু এই রামচন্দ্রই নিজের পরাক্রম সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হইলেও মুখ অভিষেকের পূর্ব্ব দিন বিমাতার হইতে যখন শুনিলেন, তাঁহার পিতা তাঁহার

বনবাস ও ভরতের অভিষেক-সম্পর্কে কৈকেয়ীর নিকট বাক্যবদ্ধ হইয়াছেন, তখন বলপ্রয়োগে এই অন্যায় প্রতিরোধ করিবার কথা তাঁহার মনে ত আসিলই না, তিনি কোন প্রকার ক্রোধ বা বিরক্তিও প্রকাশ করিলেন না; এক মুহূর্ত্ত মাত্র নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া শুধু বলিলেন, আমি বনেই যাইব; ভরতকে আনিবার জন্য তাহা হইলে দূত প্রেরণ করা হউক।

এত সহজে যে তিনি রাজী হইবেন, তাহা কৈকেয়ীও আশা করেন নাই। যদি রাম আবার মত-পরিবর্ত্তন করেন এই ভয়ে তিনি মিথ্যা করিয়াই রামকে জানাইলেন যে, রাম বনে না গেলে দশরথ স্নান পর্য্যন্ত করিবেন না। রাম এই নিষ্ঠুর কথাতেও বিচলিত হইলেন না; শুধু বলিলেন যে, জননী কৌশল্যার অনুমতি লইয়া এবং সীতাকে কথাটা জানাইয়াই তিনি চলিয়া যাইবেন।

রাম সেখান হইতে বাহির হইয়া একবার মাত্র নগরীর উৎসব-সজ্জা ও নিজের অভিষেকের আয়োজনের দিকে তাকাইলেন—তাহার পর দেবী কৌশল্যার মন্দিরে গিয়া তাঁহাকে সব কথা জানাইয়া, তাঁহার অনুমতি চাহিলেন। কৌশল্যা বরং এত সহজে বন-গমনে সম্মতি দিতে চাহিলেন না। তাঁহার মায়ের প্রাণ এই অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তিনি নানা প্রকারে রামচন্দ্রকে এই কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। এমন কি একবার এ-যুক্তিও দিলেন যে, পিতাও যেমন তোমার গুরুজন, মাতাও তেমনি। পিতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা উচিত নয়। আমি বলিতেছি, তুমি এ-সত্য পালন করিও না!

কিন্তু রামই তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিলেন। শুধু ত তাঁহারই সত্য নয়, পিতার সত্য-রক্ষা করাও ত পুত্রের কর্ত্তব্য! নহিলে দশরথ যে কৈকেয়ীর কাছে সত্যভ্রষ্ট হন!...লক্ষ্মণ এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বৃদ্ধ রাজার মাথা খারাপ হইয়াছে, তাঁহার কথা শুনিবার আবশ্যক নাই—এই যুক্তি দিয়া তিনি রামচন্দ্রকে বনবাসের সঙ্কল্প ত্যাগ

করিতে বলিলেন, এমন কি তিনি একবার পিতৃ-হত্যা করিবার জন্যও রুখিয়া উঠিলেন। সেই লক্ষ্মণই আবার রামের যুক্তিতে ও সংযত, মধুর বাক্যে যেন অন্য মানুষ হইয়া রামের অনুগমন করিবার অনুমতি লইয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। অবিচার যাঁহার উপর করা হইল, তিনিই দেখি সকলের ক্রোধ হইতে অবিচারকারীকে রক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন।

বনগমন কালে রামচন্দ্র যে আশ্চর্য্য সংযম ও স্থির-বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। বারবার সকলকে দশরথ ও কৌশল্যাকে দেখিবার অনুরোধ জানাইয়া, কৈকেয়ীরও চরণ-বন্দনা করিয়া তিনি সীতা ও লক্ষ্মণসহ যখন রথে উঠিলেন, তখন দশরথ ও কৌশল্যা উন্মত্তের মত রথের পিছনে ছুটিতে লাগিলেন। তাঁহাদের নিরস্ত করা অসম্ভব বুঝিয়া রাম সারথিকে বলিলেন, জোরে রথ চালাও—শীঘ্র দৃষ্টির বাহিরে চল।

যে সকল ব্রাহ্মণ ও অযোধ্যার নাগরিকরা রামের সহিত বনে যাইতে চাহিলেন, রামই তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিলেন। কিন্তু রাম যতই সংযমী হউন, যতই মহৎ তিনি হউন, তিনি যে মানুষ সে-পরিচয় দিলেন বাল্মীকি তাঁহার প্রথম দিনের বনবাসের রাত্রে। আজন্ম রাজসুখভোগের মধ্য হইতে আসিয়া, গভীর বনে অনাহারে গাছের তলায় রাত্রি যাপন করার কষ্ট তাঁহাকেও বিচলিত করিয়া তুলিল—তিনি নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। কখনও কল্পনা করিলেন, ভরত এই ব্যবস্থায় প্রীত হইয়া এতক্ষণ কেমন আনন্দ করিতেছে! কখনও তাঁহার আশঙ্কা হইল, কৈকেয়ী ভরতের পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য নিশ্চয়ই দশরথকে বিষ-প্রয়োগ করিবে! এই আশঙ্কাই যেন তাঁহার বেশি। তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন, তুমি গিয়া দশরথকে বাঁচাও, নহিলে পিতার অপমৃত্যু অনিবার্য্য। কখনও তিনি কতকটা যেন নিজেকে প্রবোধ দিবার জন্যই বারবার সীতা ও লক্ষ্মণকে শুনাইতে লাগিলেন,

নিতান্ত পিতা অধর্ম্মে পতিত হইবেন তাই, নহিলে আমি ভুজবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে সক্ষম। আমি দুর্ব্বল নহি!

কিন্তু সে ঐ রাত্রিটুকুই। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে এ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য চলিয়া গেল। বরং বনের মধ্যে প্রকৃতির অপরূপ শোভা দেখিয়া তিনি উৎফুল্লই হইয়া উঠিলেন। ভরতকে তিনি প্রথম রাত্রিতে একটু সংশয়ের চোখে দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভরত যখন তাঁহাকে ফিরাইয়া লইতে আসিল, তখন দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া লক্ষ্মণ সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেও, রাম তাঁহাকে শরাসন ত্যাগ করিতে বলিলেন এবং পরম স্নেহে ভরতকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাঁহাকে নানাবিধ সান্ত্বনা দিলেন। তথাচ ভরতের কোন অনুনয়-বিনয়েই তিনি নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে ফিরিতে রাজী হইলেন না। শুধু ভরত কেন, সমস্ত রাজ-পরিবার, গুরু বশিষ্ঠ, প্রত্যেকেই তাঁহাকে 'রাজার মৃত্যুর পর আর সত্য রক্ষা করার আবশ্যক নাই' এ-কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের আবেদন রামচন্দ্রের অন্তর স্পর্শ করিল না। তিনি যাহা সত্য এবং কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বিচ্যুত হইতে সম্মত হইলেন না।

রামচন্দ্রের এই সব অদ্ভুত স্বার্থত্যাগ ও মহত্ত্ব-দর্শনে যেমন তাঁহাকে অলৌকিক বলিয়া মনে হয়, তেমনি সঙ্গে সঙ্গেই, প্রায় পাশাপাশি দৃশ্যে—তিনি যে মানুষই সে কথাও কবি আমাদের ভুলিতে দেন নাই। চিত্রকূটের পর মনোরম পঞ্চবটীতে গিয়া কুটির নির্ম্মাণ করিয়া রাম সুখে বাস করিতেছেন, এমন সময় বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল! রাবণ আসিয়া সীতাহরণ করিয়া লইয়া গেল। এই আর-একবার আমরা রামকে বিচলিত হইতে দেখিলাম। এবার আর দুঃখে নয়—শোকে, বিরহে।

সীতার অভাবে রাম উন্মত্তের মত কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই সময় তিনি কি বলেন তাহারও ঠিক নাই—কি করেন তাহারও ঠিক নাই।

তাহার সে উন্মত্ততা আরও বৃদ্ধি পাইল, যখন দক্ষিণ দিকে যাইতে যাইতে সীতার স্খলিত অলঙ্কার ও জটায়ুর সহিত রাবণের যুদ্ধের ফলে রক্তচিহ্নসমূহ তাঁহার চোখে পড়িল। তিনি দূর হইতে জটায়ুকে দেখিয়া, তাঁহাকেই সীতা-ভক্ষণকারী রাক্ষস মনে করিয়া বিনাবিচারে বধ করিতে যাইতেছিলেন। জটায়ু নিজের পরিচয় দিতে রামচন্দ্র সমস্ত শুনিয়া আরও দক্ষিণদিকে যাইতে লাগিলেন—আরও খানিকটা চলিবার পর সুগ্রীব ও হনুমানের দেখা পাইলেন।

এইবার যে ব্যাপারটি ঘটিল, সেইটিই বোধ হয় রাম-চরিত্রের মধ্যে একমাত্র কলঙ্ক। সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধেতে বালীকে অন্তরাল হইতে নিরস্ত্র অবস্থায় বধ করা কোন মতেই ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কাজ হয় নাই—রামচন্দ্রের ত নহেই। কিন্তু এখানে বোধ হয় সীতার শোকই রামকে এ-কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল। সুগ্রীব যদি বালী-বধ করিতে পারে, তবে সে বানরদের সিংহাসন পাইবে এবং তাহার বিনিময়ে রামচন্দ্রকে সীতা-উদ্ধারে সাহায্য করিবে—এই সর্ত্ত হইয়াছিল। সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব সুগ্রীব সিংহাসন পায় সেই দিকেই রামের লক্ষ্য ছিল, অত ন্যায়-অন্যায় বিচার করিবার অবসর তিনি পান নাই। ইহা ছাড়াও—সুগ্রীব বালীকে দুরাচার ও অত্যাচারীরূপে রামের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন। দুরাচারকে দণ্ড দিবার জন্য ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ-নিয়ম মানিবার আবশ্যক নাই—এই নীতি অনুযায়ীই বোধ হয় তিনি বালীর সঙ্গে যুদ্ধে শাস্ত্র-রীতি মানিয়া চলিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই।

রামচন্দ্রের চরিত্রের আর একটি বিশেষ দিক আমরা দেখিতে পাই, যখন বিভীষণ আসিয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন। বিভীষণ শত্রুপক্ষের লোক, হয়ত এ সবই ছলনা—এসব কোন কথাই রাম ভাবিলেন না, কাহারও কোন নিষেধ শুনিলেন না, একেবারে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বুকে স্থান দিলেন।

যুদ্ধের সময়ও বহু রাক্ষস গুপ্তচর তাঁহাদের ব্যূহ, যুদ্ধ-কৌশল প্রভৃতির সংবাদ লইতে আসিয়া ধরা পড়িয়াছে, বানরদের হাতে পড়িয়া তাহাদের লাঞ্ছনাও কম সহিতে হয় নাই, কিন্তু রামচন্দ্রের কানে সে-কথা পৌঁছিবার পর আর কাহারও মুক্তি পাইতে বিলম্ব হয় নাই—এসব ব্যাপারে তিনি নিজের ক্ষতি একবারও ভাবেন নাই। অন্য কথায় কাজ কি, তিনি যুদ্ধকালে, ভয়ঙ্কর শত্রুদের—এমন কি রাবণকে পর্য্যন্ত—বিপন্ন অবস্থাতে পাইয়াও ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি সমস্ত রাক্ষসকুল বিনষ্ট করিয়াছেন ন্যায়যুদ্ধে—কখনও কোনও কারণেই সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করেন নাই।

এই যুদ্ধের সময় আমরা রাম-চরিত্রের আর একটি দিক দেখিতে পাই—সেটি হইল তাঁহার সুগভীর ভ্রাতৃস্নেহ। তিনি সীতার শোকে কাতর, সীতাকে উদ্ধার করাই তখন তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত বটে, কিন্তু লক্ষ্মণ যখন শক্তিশেলের আঘাতে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন, তখন রামচন্দ্র সে সব কথাই ভুলিয়া গেলেন। লক্ষ্মণের মৃত্যু হইলে, তিনিও তৎক্ষণাৎ সহগমন করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন; এমন কথাও তাঁহার মুখে শোনা গেল যে, সীতা-উদ্ধারে তাঁহার কাজ নাই, রাক্ষস-রাজ রাবণ সুখে থাকুন—তিনি কোনমতে লক্ষ্মণকে লইয়া ফিরিতে পারিলেই সুখী হইবেন!

যখন রাবণ মৃত্যু-শয্যায় শায়িত, তখন অত দুঃখের কারণ, অত বড় শত্রুর নিকটেও রাজ-ধর্ম্মের উপদেশ লইতে গেলেন রামচন্দ্র এবং রাবণের প্রতিটি উপদেশ বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ করিলেন। এইটিই রাম-চরিত্রের বিশেষত্ব—ক্রোধ বা বিদ্বেষ তাঁহার মনের মধ্যে কখনও বদ্ধমূল হইতে পারিত না। কিম্বা তাহা তাঁহার নির্ম্মল বিচার-বুদ্ধিকেও কখনও আচ্ছন্ন করিত না।

রাম-চরিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা জটিল ব্যাপার হইল সীতার অগ্নিপরীক্ষা। যে সীতার জন্য রামের এত দুঃখ, যাঁহার জন্য এত বড় লঙ্কার সমর, তাঁহাকেই

শেষ পর্য্যন্ত তিনি বলিলেন, ইক্ষ্বাকু-বংশের বধূকে উদ্ধার না করিলে আমাদের বংশের অপমান, তাই তোমাকে উদ্ধার করা হইল। কিন্তু রাবণ তোমার হাত ধরিয়াছে, তুমি রাক্ষসের ঘরে এতদিন ছিলে, তোমাকে আর বাড়ীতে ফিরাইয়া লইতে পারি না।

সীতার অশ্রুজল, লক্ষ্মণের অনুযোগ ও অনুনয়, সমস্ত বানরকুলের হাহাকার কিছুই রামকে তাঁহার এই সঙ্কল্প হইতে টলাইতে পারিল না। "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি" রামের চরিত্রের ইহাই হইল বৈশিষ্ট্য। যে রাম এত কোমল, তিনিই আবার এত কঠোর।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, এটা শুধুই সাধারণ লোকের জন্য। তিনি রাজা। তিনি যদি নির্ব্বিচারে তখন সীতাকে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে প্রজা-সাধারণের উপর এই কার্য্যের কি প্রভাব পড়িবে—এই আশঙ্কাতেই তিনি ঐ কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এবং সেই জন্যই সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করিলে, স্বয়ং অগ্নি যখন সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "সীতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা, তাঁহাকে গ্রহণ করিলে কোন অন্যায় হইবে না" তখন রামচন্দ্র আর একবারও ইতস্ততঃ করিলেন না; বরং স্বীকারই করিলেন যে তিনি বরাবরই সে-কথা জানিতেন, শুধু লোকাপবাদ ভয়েই এত দূর কঠোর কথা বলিয়াছিলেন।

রাম যে মানুষ—তাঁহার চরিত্রের সেই মনুষ্যত্বের পরিচয় পাই আমরা আর একবার···ফিরিবার সময়। চৌদ্দবৎসর পরে রাম সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া ফিরিতেছেন, হনুমান সেই সংবাদ লইয়া অগ্রে যাইবেন। রাম হনুমানকে চুপি চুপি বলিয়াছিলেন, সংবাদটা শুনিয়া ভরতের মুখ দুঃখে মলিন হয় কিংবা হর্ষে উজ্জ্বল হইয়া উঠে—লক্ষ্য করিবে। অর্থাৎ এতদিন রাজত্ব করার ফলে হয় ত ভরতের রাজ্যে আসক্তি জন্মিয়াছে, তাহা হইলে রামচন্দ্রের ফিরিবার কথা শুনিয়া তিনি বিমর্ষই হইবেন। রাম নিজে মানুষ, তাই

মানুষের দুর্ব্বলতার কথা জানিতেন—আর সেই জন্যই তিনি হনুমানকে ঐ উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য কিন্তু খারাপ ছিল না। যদি ভরতের ঐশ্বর্য্যে আসক্তি জন্মিয়া থাকেই, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে রাজত্ব হইতে বঞ্চিত করিবেন না—এই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়!

তাহা হইলে মোটামুটি আমরা রাম-চরিত্রে কি দেখিতে পাইলাম?

সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথাগুলি যাহা চোখে পড়ে তাহা হইল এই—রাম সত্যনিষ্ঠ, পিতৃ-মাতৃভক্ত, স্নেহশীল ও কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং সকলের উপরে হইল, তাঁহার অদ্ভুত আত্মসংযম এবং ঐশ্বর্য্যে বীতস্পৃহা! রাজত্বে তাঁহার লোভ নাই, তাঁহার নিকট রাজ্যের চাইতেও সত্যই বড়—গুরুজনদের প্রতি ভক্তি বড়। তাঁহারই উপর অবিচারের জন্য যখন সকলে রাজা ও কৈকেয়ীর উপর খড়্গহস্ত, তখন তিনিই সকলকে মিষ্টবাক্যে সংযত করিতেছেন—এ দৃশ্য সত্যই অদ্ভুত! তবে দুই-একবার যে ধৈর্য্যচ্যুতি তাঁহার ঘটিয়াছে, সে তিনি নিতান্ত মানুষ বলিয়াই এবং তাহার জন্যই রাম-চরিত্র এত মধুর!

দশরথ

দশরথের উপর, যাঁহারাই রামায়ণ পাঠ করেন, প্রত্যেকেরই ক্রোধ জন্মে। তাহার কারণ অবশ্য রামের বনগমনের জন্য কৈকেয়ীকে প্রতিশ্রুতি-দান।

কিন্তু তাঁহার অন্যায় ঠিক কতটা—প্রথমেই বিচার করা কর্ত্তব্য। তখনকার দিনে সকলেই সত্য-পালনকেই সকলের চেয়ে বড় বলিয়া মনে করিতেন; মুখ হইতে যে-কথা নিঃসৃত হইল, যে-প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল, তাহা যেন কখনও মিথ্যা না হয়—এই ছিল তখনকার লোকের সাধনা। মিথ্যার চেয়ে বড় পাপ আর নাই। দশরথ তখনকার দিনের লোক এবং তিনি যে

অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ রাজা ছিলেন, সে-পরিচয় আমরা রামায়ণে প্রচুর পরিমাণেই পাই। সুতরাং তিনি কৈকেয়ীকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন বলিয়াই যে রামের বিচ্ছেদ—এমন কি নিজের মৃত্যু পর্য্যন্ত বাঞ্ছনীয় মনে করিবেন, তত্রাচ প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে চাহিবেন না, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিবে, তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন কেন? সে কি তিনি কেবল স্ত্রৈণ বলিয়াই? তাহা নহে। তিনি কৈকেয়ীকে একটু বেশি স্নেহ করিতেন বটে, কিন্তু কৈকেয়ীও তাহার জন্য কম তপস্যা করেন নাই। তাঁহার স্বামী-সেবার যে বিবরণ আমরা রামায়ণে পাই, তাহাও অসামান্য। যে বেশী সেবা করে, তাহাকে দশরথ বেশী স্নেহ করিবেন—তাহাতে আর বিস্মিত হইবার কি আছে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাল্মীকি প্রতি চরিত্রটিকেই মানুষ করিয়া আঁকিয়াছেন। মানুষের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক দশরথ তাহাই করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, কৈকেয়ীকে তিনি বহুদিন পূর্ব্বেই অতি দুঃসময়ে দু'টি বর দিতে চাহিয়াছিলেন; সেই বরই এতদিন পরে কৈকেয়ী ঐ ভাবে চাহিবেন, তাহা দশরথ কল্পনা করেন নাই—কিন্তু যখন বর দিয়াছেন, তখন আর ফিরাইয়া লইবার উপায় নাই। তাহা হইলে সত্য যায় যে!

কিন্তু তাই বলিয়া রামের প্রতি দশরথের স্নেহ কম ছিল না। যখন বিশ্বামিত্র রামকে চাহিতে আসিলেন, তখন দশরথ 'অন্য যে কাহাকেও হউক' দিতে চাহিয়াছিলেন। অভিষেকের সময়ও হয়ত ভরত ও ভরতের মাতামহ উপস্থিত থাকিলে কোন বিভ্রাট ঘটিতে পারে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই দশরথ ভরতের মাতুলালয়ে যাইবার অবসরে তাড়াতাড়ি অভিষেক সারিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কৈকেয়ী যে এমন করিবেন তাহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। কারণ কৈকেয়ী ভরতের অপেক্ষা রামকেই বেশী স্নেহ করেন, এই কথাই সকলে জানিত।

কৈকেয়ীকে বর দিয়া দশরথের যে কষ্ট তাহাও ত আমরা দেখিতে পাইয়াছি। কৈকেয়ী তাঁহার বরের বিষয় বর্ণনা করিলে, কিছুক্ষণ দশরথের বাক্যস্ফূর্তি হয় নাই। তাহার পর কৈকেয়ীকে কত অনুনয়-বিনয় করিলেন, কত ভর্ৎসনা করিলেন, কত গালি দিলেন তবু কৈকেয়ী বিচলিত হইলেন না। দশরথকে ইহার পর আমরা দেখি, শোকে-লজ্জায় মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছেন—এমন কি রামচন্দ্রের সম্মুখে মুখ তুলিয়া কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারিতেছেন না—কৈকেয়ী বরের কথা রামকে শুনাইতেছেন। তারপর যখন রামের বনগমন আসন্ন হইয়া আসিল তখন হাহাকার করিতে করিতে দশরথ তাঁহাকে নিজেরই আদেশ লঙ্ঘন করিতে অনুরোধ করিলেন—নিতান্ত পক্ষে আর একটি রাত্রি থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রাম জানিতেন যে, মায়ার বন্ধনে যত জড়াইবেন ততই তাহা ছিন্ন করা কঠিন হইবে। তাই তিনি কিছুতেই বিলম্ব করিলেন না, নিজের সত্যরক্ষার অজুহাতে চলিয়া গেলেন। রাজা তাঁহার রথের পিছনে পিছনে কাঁদিতে কাঁদিতে কিছুদূর পর্য্যন্ত ছুটিয়া গেলেন এবং যখন রথ একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন তিনি কৌশল্যার মন্দিরে গিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ও তাঁহার ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। তিনি এই সময়েই কৈকেয়ীকে স্পষ্ট বলিয়া দিলেন যে, তাঁহার সহিত দশরথের আর কোন সম্পর্ক রহিল না।

ইহার পর দশরথ আর অন্নজল গ্রহণ করেন নাই এবং মাত্র সাতদিন বাঁচিয়া ছিলেন। তিনি যে অনুতাপে কতদূর দগ্ধ হইতেছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—যেখানে কৌশল্যার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে, তিনি দশরথকে কঠিনভাবে তিরস্কার করিতেছেন। দশরথ সেই সব কঠোর বাক্যের বিনিময়ে একটি কথাও বলেন নাই, বরং নতশিরে কৌশল্যার ক্ষমাভিক্ষা করিয়াছেন। কৌশল্যাই পরে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া আবার ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়াছেন।

বাল্মীকি দশরথের চরিত্রের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "তিনি সত্যবাক্, ধর্মাত্মা, সাগরোপম গম্ভীর, উজ্জ্বল চরিত্রবান্, অজাতশত্রু, অমিততেজা, জিতেন্দ্রিয়, প্রজাবৎসল ও আকাশের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক ছিলেন।" রামায়ণ আদ্যোপান্ত পড়িলে ইহার সত্যতা বুঝিতে পারা যায়।

লক্ষ্মণ

রামচন্দ্র যে সব কষ্ট সহ্য করিয়াছেন তাহা তাঁহার পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠিত, যদি স্নেহাস্পদ ভ্রাতা লক্ষ্মণ চিরদিন ছায়ার মত তাঁহার সঙ্গে না থাকিতেন।

লক্ষ্মণ চিরদিনই রামচন্দ্রময় প্রাণ। তাঁহার যেন নিজের সত্তাই নাই, রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার সমস্ত সুখ-দুঃখ চিরকালের জন্য মিশিয়া গিয়াছে। একেবারে ছোটবেলা হইতেই আমরা দেখিতে পাই, লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের নিত্য-সহচর।

বিশ্বামিত্রের সহিত রাম যখন তাড়কা-বধে যাইতেছেন, তখনও লক্ষ্মণ তাঁহার সঙ্গে। আবার যখন চৌদ্দ বৎসরের জন্য রাম নিজের সত্য-পালনের জন্য বনে যাইতেছেন, তখনও লক্ষ্মণ তাঁহার সাথী। প্রথমটা তিনি রামকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, রামের প্রতি অবিচারে ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের পিতাকে পর্য্যন্ত তিনি গালাগালি করিতে লাগিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন রামচন্দ্র অটল, তখনই তিনি মনস্থির করিয়া ফেলিলেন—রাম-বিনা লক্ষ্মণ নাই, তিনিও বনে যাইবেন। তাঁহার যাইবার কোন কারণ ছিল না—শুধু ভ্রাতার সঙ্গে যাইবেন, এইটুকুর জন্যই তিনি অকারণে নিজের সমস্ত বিলাস,

সমস্ত রাজসুখ-ভোগ ত্যাগ করিয়া এক মুহূর্তেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

বনে গিয়াও লক্ষ্মণ যে-জীবন যাপন করিতে লাগিলেন, তাহা শুধু নিরবচ্ছিন্ন স্বার্থত্যাগেরই ইতিহাস। তিনিই কুটির নির্ম্মাণ করেন, তিনিই আহার্য্য সংগ্রহ করেন, তিনিই পাহারা দেন—রামচন্দ্রের যাহাতে এতটুকু কষ্ট না হয়, সেইজন্যই সর্ব্বদা চেষ্টিত।

ভরতের স্বার্থত্যাগ আমাদের খুব চমক লাগায় বটে, তাহার কারণ অত বড় বিশাল সাম্রাজ্য অনায়াসে একটা লোকের হস্তগত হইয়াছিল, অথচ সে লোকটি নিজেই হেলায় তাহা প্রত্যাখ্যান করিল শুধু বড় ভাইয়ের প্রতি স্নেহবশতঃ—এরূপ একটি ঘটনা ঘটিতে দেখিলে বিস্মিত হইবারই কথা; কিন্তু ভরতের সেই বিস্ময়কর স্বার্থত্যাগের অপেক্ষা লক্ষ্মণের দিনের পর দিন ধরিয়া নিজের সত্বা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া এই যে আত্মত্যাগ, তাহা আমাদের মতে অনেক বড়।

কিন্তু এই অদ্ভুত আত্ম-নিবেদনের মধ্যে লক্ষ্মণের পৌরুষ, তাঁহার বলদৃপ্ত তেজস্বিতার কথাটা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। যখনই তিনি রামের বনবাসের কথা শুনিলেন, তখনই তিনি হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন—শরাসন-হস্তে সমগ্র অযোধ্যা-পুরী ধ্বংস করিতেও উদ্যত হইলেন। এই যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ইহা আমরা লক্ষ্মণের চরিত্রে আগাগোড়াই দেখিতে পাই। সীতার অগ্নি-পরীক্ষার আদেশ পাইতেও তিনি প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন, সীতার বনবাসের সময়ও রামকে উচিত কথা শুনাইতে ছাড়েন নাই। তিনি তাঁহার স্নেহপরায়ণ সত্যসন্ধ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ-পালন করিয়াছেন, কিন্তু সমর্থন করেন নাই কখনও!

ভরত

রামায়ণের সমস্ত পাত্র-পাত্রীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পূত-চরিত্র ভরতের। গুহক চণ্ডাল বলিয়াছিলেন, এই ত্যাগী মহাপুরুষের তুলনা নাই, ইনি ধন্য—সে কথা সর্ব্বতোভাবে সত্য।

আমরা আগেই বলিয়াছি যে বাল্মীকি রামায়ণে মানুষের ছবিই আঁকিতে চাহিয়াছেন, সেই জন্য কোন চরিত্রই নিখুঁত করেন নাই—কিছু-না-কিছু কলঙ্ক সব চরিত্রেরই আছে। কিন্তু একমাত্র ভরত-চরিত্রই বোধ হয় ইহার ব্যতিক্রম। কারণ ভরত-চরিত্র প্রায় নিষ্কলঙ্ক।

অথচ ভরতকেই লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছে সবচেয়ে বেশী। রাজা দশরথ তাঁহাকে সাধু-চরিত্র বলিয়া জানিতেন, তথাপি সন্দেহ করিয়া তাঁহার অনুপস্থিতিতে অভিষেকের ব্যবস্থা করিতে গিয়া এমন বিভ্রাট বাধাইলেন যে, ভরতের সমস্ত জীবন মসীলিপ্ত হইয়া গেল।

কৈকেয়ী মন্থরার পরামর্শে করিলেন কুকার্য্য, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল ভরতকে দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়া; রাজার পুত্রকে জটা-চীর পরিয়া চৌদ্দ বৎসর সন্ন্যাসী রূপে কাল কাটাইতে হইল।

অথচ সকলে ভরতকেই সন্দেহ করিয়াছিলেন বেশি। রাম প্রথম রাত্রি বনে গিয়া ভরত সম্বন্ধে কটাক্ষ করিয়াছিলেন যে, ভরতের চক্রান্তেই এই সব ঘটিয়াছে। এমন কি যে-দূত মাতুলালয়ে ভরতকে ডাকিতে গেল, তাহাকে যখন ভরত ব্যাকুল-কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, অযোধ্যার সব কুশল ত?—তখন সে দূত পর্য্যন্ত বাঁকাভাবে জবাব দিল, আপনি যাহাদের কুশল চাহেন, তাহারা সকলেই কুশলে আছেন।

বেচারী ভরত! তিনি শপথ করিয়া, কত রকমে নিজের নির্দ্দোষ প্রমাণ করিয়া, উপবাসী থাকিয়া, দীনভাবে সকলকে সঙ্গে করিয়া যখন রামকে

ফিরাইতে যাইতেছেন, তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকেই মন্দ সন্দেহ করিয়া হত্যা করিবার জন্য ধনুর্ব্বাণ প্রস্তুত করিয়াছেন।

শুধু কি তাই! স্বয়ং রামচন্দ্র পর্য্যন্ত একাধিকবার ভরতকে সংশয়ের চোখে দেখিয়াছেন। মূল গ্রন্থে আছে, সীতাকে রাম আড়ালে ভরতের কাছে নিজের প্রশংসা করিতে নিষেধ করিতেছেন। 'ঐশ্বর্য্যবান ব্যক্তিরা পরের প্রশংসা সহিতে পারে না'—এই হইল তাঁহার যুক্তি! আবার লঙ্কা হইতে ফিরিবার পথে যে ভরত চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়া কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন করতঃ রামচন্দ্রের আশাপথ চাহিয়া আছেন—সেই ভরতেরই মুখভাব লক্ষ্য করিবার নির্দ্দেশ দিলেন হনুমানকে স্বয়ং রামচন্দ্র।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভরতের ভ্রাতৃপ্রেমের মূল্য রামচন্দ্র বুঝিতেন; তাই রামচন্দ্র একাধিকবার বলিয়াছেন, 'ভরতের মত ভাই হয় না, ভরতের মত স্বার্থত্যাগী সাধুচরিত্র লোক দুর্ল্লভ!'

বস্তুতঃই এমন নিষ্কলঙ্ক, পূত-চরিত্র, মহাপুরুষ রামায়ণে আর একটিও দেখা যায় না।

সীতা

সমগ্র ভারতের সমস্ত হিন্দু-রমণীদেরই জীবনের চরম আদর্শ হইতেছেন সীতা দেবী। তাঁহার অপূর্ব্ব স্বামি-ভক্তি, তাঁহার অদ্ভুত আত্মত্যাগ, পবিত্র-মধুর স্বভাব—তাঁহাকে আমাদের হৃদয়মধ্যে এক মহিমামণ্ডিত মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

সীতাকে যখন আমরা প্রথম দেখি, তখন তিনি জনক-রাজার প্রিয়তমা

কন্যা মাত্র—তাঁহার কোন বৈশিষ্ট্যই তখনও নজরে পড়ে নাই। প্রথম তাঁহাকে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম, যখন রামচন্দ্র বনগমনের পূর্ব্বে সীতার কাছে বিদায় লইতে আসিলেন। সীতা দেবী তখন বালিকামাত্র—কিশোরী বধূ। কিন্তু তিনি সমস্ত কথা শুনিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, কোন প্রকার রোষ বা ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন না—শুধু বিনয়-নম্র অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জানাইয়া দিলেন যে, বিদায় লইবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ তিনিও রামের সঙ্গে যাইবেন। রাম ত স্তম্ভিত! তিনি অনেক করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, সে বড় ভয়ানক স্থান—কত ভয়ানক তাহা সীতার ধারণা পর্য্যন্ত নাই! সেখানে নিশাচর রাক্ষস এবং হিংস্র জন্তু সর্ব্বদা বিচরণ করে—সেখানে বর্ষা বা শীতে আশ্রয় পাওয়া কঠিন, আহার্য্যেরও যৎপরোনাস্তি কষ্ট। সীতা রাজকন্যা, রাজকুলবধূ—চিরকাল সুখে লালিত-পালিত—তিনি সে-কষ্ট একদিনও সহ্য করিতে পারিবেন না। কিন্তু সীতা বলিলেন, স্বামীকে ছাড়িয়া সহস্র রাজান্তঃপুরের বিলাসও তাঁহার মনোমত নহে—স্বামীর সঙ্গ ছাড়া আর কিছুতেই তাঁহার সুখ নাই।

রাম শেষে যুক্তি দিলেন যে, গুরুজনদের কাছে থাকা সীতার কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহাতেও সীতা বিচলিত হইলেন না। বলিলেন, বাল্যকাল হইতে গুরুজনদের মুখেই অবিরত শুনিয়াছি যে পতি ছাড়া স্ত্রীলোকের অন্য গতি নাই। সকল অবস্থাতে স্বামীর অনুগমন করাই স্ত্রীলোকের একমাত্র কর্ত্তব্য।

তাহাতেও যখন রাম ইতস্ততঃ করিতেছেন, তখন সীতা দেবী রামের কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রামের সহিত যাইবার অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। তখন আর রাম থাকিতে পারিলেন না, অনুমতি দিলেন।

সীতা রামের সহিত যাইতে পারিলেই সুখী, অন্য কোন দিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহার চীরবাস পরিধানের কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ

তিনি ত আর সত্যবদ্ধ নহেন—তথাপি কৈকেয়ী তাঁহার জন্যও চীরবাস পাঠাইয়া দিলেন। সীতার কিন্তু তাহাতেও কোন ভাবান্তর নাই! শুধু তিনি রামকে লজ্জিত মুখে অনুরোধ করিলেন, চীরবাস কেমন করিয়া পরিতে হয় দেখাইয়া দিতে। তিনি রাজার কন্যা, রাজার বধূ—বল্কল-পরিধান ত তাঁহার জানার কথা নয়। এবং সেইটুকু বলিতেই কত সঙ্কোচ তাঁহার!

রাবণ যখন তাঁহাকে হরণ করিতে আসিল, তখন সীতা তাহাকে তপস্বী মনে করিয়াই অর্ঘ্য দিতে আসিলেন; কিন্তু ভণ্ড তপস্বী ত অর্ঘ্য বা আতিথ্য লইতে আসে নাই, সে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মশাপের ভয় দেখাইল। সরলা সীতা পাছে ব্রহ্মশাপে রামেরই অনিষ্ট হয়, এই ভয়ে বাহির হইয়া আসিলেন; কিন্তু রাবণ যখন নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল, তখন সীতাও ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়া রমণী তিনি—দশরথের বধূ ও রামচন্দ্রের স্ত্রী—সামান্যা রমণীর মত কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন না। তিনি রামচন্দ্রের ও শ্বশুর দশরথের কীর্ত্তি বর্ণনা করিয়া, রাবণকে সতর্ক করিয়া দিলেন, রামচন্দ্র সাধারণ মানুষ নহেন, তাঁহার সঙ্গে বিবাদ করিতে যাওয়া আর সাক্ষাৎ যমের সঙ্গে বিবাদ করা একই কথা। সে-কথা বার বার তিনি রাবণকে শুনাইয়া দিলেন।

ইহার পর আমরা সীতাকে দেখি অশোক বনে। সে বড় করুণ দৃশ্য! কিন্তু সীতা সেখানে মহিমান্বিতা—চেড়ীরা যখন অত্যাচার করিতেছে, তখনও তিনি শান্ত সমাহিত ভাবে বসিয়া সব সহ্য করিতেছেন। আবার যখন সরমা আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছেন, তখনও তাঁহার তেমনি অবিচলিত ভাব—তখনও তিনি ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই।

তারপর অগ্নি-পরীক্ষা। অগ্নি-পরীক্ষার দৃশ্যে সীতাকে দেখিলে, বোধ করি, কোন পাষণ্ডই চোখের জল রোধ করিতে পারিবে না। এত দিন এত দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিলেন যাঁহার ধ্যান করিয়া, তিনিই রুক্ষস্বরে কহিলেন, তোমার

যেখানে খুশী তুমি যাইতে পার। আমার কর্ত্তব্য ছিল তোমাকে উদ্ধার করা, আমি করিয়াছি—আর কোন কর্ত্তব্য নাই।

কিন্তু তবুও সীতা রামকে দোষী করিলেন না, একটি কটু কথাও বলিলেন না, শুধু নিজের দুর্ভাগ্যে নিজেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এমন কি যখন চিতানল জ্বলিয়া উঠিল, সেই জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেও তিনি রামচন্দ্রকে ভক্তিভরে নমস্কার করিয়াই চিতাগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। আবার যখন অগ্নি তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন এবং রামচন্দ্র গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন, তখনও সীতা এতটুকু অভিমান প্রকাশ করিলেন না। স্বামি-ভক্তি জগতে দুর্লভ নহে, কিন্তু এমন নিরহঙ্কার, নিরভিমান পতিপ্রেম জগতে বিরল। সেই জন্যই সীতা দেবী আমাদের সকলের পূজ্যা।

সীতার জীবন দুঃখের জীবন। লোকাপবাদে সীতার নির্ব্বাসন হইল। তবু সীতা রামকে দোষ দিলেন না; বরং যাহারা দোষ দিতে আসিলেন, সীতা তাহাদেরই শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। সভামধ্যে যখন পরীক্ষার কথা উঠিল, তখনও তিনি দোষ দিলেন নিজের ভাগ্যেরই। গভীর দুঃখেই তিনি মেদিনী প্রবেশ করিলেন, অভিমানে নহে।

সীতার মত ধৈর্য্য, সীতার মত পতিভক্তি, সীতার মত অন্তর-মাধুর্য্য সত্যই বিরল—তাই যুগ যুগ ধরিয়া তিনি বিশ্বের বিস্ময় হইয়া আছেন।

রামায়ণের প্রভাব

রামায়ণের ন্যায় প্রভাবান্বিত মহাকাব্য পৃথিবীতে আর নাই। রামায়ণের পূর্ব্বে কোন দেশে এমন কাব্য কখনও রচিত হইয়াছিল বলিয়াও কেহ আজ পর্য্যন্ত কোন প্রমাণ দিতে পারেন নাই। সুপ্রাচীন সভ্য গ্রীস ও এসিয়া মাইনরের মহাকবি হোমারের জগদ্বিখ্যাত মহাকাব্য "ইলিয়াডের"ও বহু চরিত্রে এই মহাকাব্য রামায়ণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে, ইলিয়ডের প্রধান চরিত্রগুলির সঙ্গে রামায়ণের প্রধান চরিত্র-গুলির বহুবিধ সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

শত শত দেশের মহাকবি রামায়ণের আদর্শে, রামায়ণের চরিত্রের অনুকরণে তাঁহাদের কাব্যের চরিত্রাবলী রচনা করিয়াছেন; কিন্তু অনুকরণ ভিন্ন রামায়ণের রাজা দশরথ, রাজা রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সীতা, উর্ম্মিলা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা, মন্থরা, হনুমান, রাবণ, বিভীষণ, মেঘনাদ, তারা, মন্দোদরী, সরমা প্রভৃতির তুল্য চরিত্র পৃথিবীর আর কোন দেশে, কোন কবি অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। যুগপৎ এমন স্বাভাবিক, হৃদয়দ্রাবী ঘটনাপরম্পরা, এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ বর্ণনা, ভাবের ও কবিত্বের এমন সুন্দর ও সুষ্ঠু প্রকাশ এবং মানুষের প্রকৃত আদর্শ ধর্ম্মনীতির এমন বিকাশ ও সমন্বয় আর কোনও কাব্যে দেখা যায় না বলিয়াই কবির এই অমূল্য, এই দুর্ল্লভ মহাকাব্যের প্রভাবে সমগ্র জগৎ এত প্রভাবান্বিত হইয়া আসিতেছে।

এই রামায়ণ মহাগ্রন্থ হিন্দু জনসাধারণের এতই প্রিয় যে, ইহার আদর্শে শুধু সংস্কৃত ভাষায় নয়, ভারতের তাবৎ প্রাকৃত ভাষায় শত শত রামায়ণ রচিত হইয়াছে। রচনাকারী কবিগণ অনুকরণ করিয়াও ধন্য বোধ করিয়াছেন। নানা ভাবে দেশময় এই রামায়ণ-কাহিনীর যেরূপ বহুল প্রচার হইয়াছে—নাটকে, উপন্যাসে, কথকতায়, যাত্রায়, গল্পে, কবিতায়,

ছড়ায় সমগ্র দেশের সমগ্র নরনারী যে ভাবে ইহা দ্বারা প্রভাবিত—জগতের কোন ভাষায়, কোন কাহিনী, কোন গ্রন্থের এরূপ প্রচার ও এরূপ প্রভাব-বিস্তারের কথা শুনা যায় না।

বঙ্গ নয়, বৃহৎ বঙ্গ নয়—ভারত নয়, বৃহত্তর ভারত নয়—এসিয়া ছাড়াইয়া যেখানেই লোকের অনুভূতি আছে, ভাবিবার, চিন্তা করিবার শক্তি আছে, সেইখানেই দেখা যায় রামায়ণের প্রভাব। তিব্বতে, জাভায়, সিংহলে, বলী দ্বীপে, জাপানে, চীনদেশে কোথায়ও ইহার প্রভাবের অপ্রাচুর্য্য নাই—অসংখ্য ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছে, হইতেছে। লক্ষ লক্ষ নরনারীকে ইহা শোকে সান্ত্বনা, দুঃখে ধৈর্য্য দান করিতেছে; পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, দাম্পত্য প্রেম, পাতিব্রত্য, প্রভু-আনুগত্য, মিত্রতার আদর্শ ও শত্রুর সহিত ব্যবহার শিখাইতেছে; স্ত্রীলোকগণকে শিখাইতেছে হৃদয় প্রসারিত করিতে, ভালবাসিতে, স্বামীর বিপদে ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী হইতে, পৃথিবীর ন্যায় ধৈর্য্যময়ী হইতে, বৃক্ষের ন্যায় ছায়া দান করিতে, বিপদের ঝড়ের মধ্যে, পাশবিক অত্যাচারের মধ্যে আত্মমর্য্যাদা ও সতীত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে।

রামায়ণী সাহিত্য

রামায়ণের বহু অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরেজী অনুবাদের মধ্যে গ্রিফিথ্ নামক একজন বিখ্যাত ইংরেজ কবির পদ্যানুবাদ ও একজন ইংরেজ মহিলার "Illiad of the East" অতি মধুর হইয়াছে। আমাদের দেশের বিখ্যাত মহিলা-কবি ৺ দত্তের "Ballads of Hindusthan" অতি সুন্দর। পশ্চিম ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারী রামসীতার নামে পাগল; পাগল করিয়াছেন সুকবি মহা-রামভক্ত তুলসীদাস গোস্বামী ঠাকুর—তাঁহার অপূর্ব্ব

হিন্দী তুলসীদাসী রামায়ণের ঝঙ্কারে। বঙ্গানুবাদের মধ্যে বঙ্গবাসী সংস্করণ ও সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সংস্করণ উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া বিভিন্ন ধরণের রামায়ণ—যেমন 'অধ্যাত্ম রামায়ণ', 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ', 'অদ্ভুত রামায়ণ' প্রভৃতি বহু আছে।

শুভ কি মাহেন্দ্রক্ষণেই না বাংলার, কুলিয়ার বাঙালী মহাকবি কৃত্তিবাস পদ্যে ইহার ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন! তেমন সরল, তেমন সুন্দর, তেমন প্রাণমাতানো প্রাঞ্জল ও মধুর ভাষার গ্রন্থ আজ অবধি একখানিও হইল না। বাংলার হিন্দু নরনারী পরম পবিত্র বোধে তাঁহার অনূদিত সেই মহাগ্রন্থ ঘরে ঘরে পূজা করেন, অহর্নিশ চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে পাঠ করেন, শান্তি ও সান্ত্বনা পান, দুঃখে সুখী হন, তৃপ্ত হন, ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া যান, হৃদয়ে নববল লাভ করেন, সংসার-সংগ্রামে অকুতোভয়ে অগ্রসর হন।

রামায়ণের নীতি ও আদর্শ

রামায়ণের ন্যায় সন্নীতিপূর্ণ মহাকাব্য ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। ইহার পত্রে পত্রে নীতি ও সদুপদেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। রামায়ণকার সুকৌশলে তাঁহার বর্ণিত এক-একটি চরিত্রের মধ্য দিয়া বিবিধ গুণের—মানুষের শিক্ষণীয়, অনুকরণীয়, প্রচুর নীতি-প্রস্রবণের—সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই প্রস্রবণ-ধারার অমৃত নিষেকে যুগ-যুগান্তর আবালবৃদ্ধবনিতা সুসমৃদ্ধ হইয়া, কৃতকৃতার্থ হইয়া আসিতেছে। রামচন্দ্রের চরিত্রে তিনি দেখাইয়াছেন রামচন্দ্র সত্যসন্ধ, শান্ত, গুণনিধি, ধার্ম্মিক, বিপ্রপ্রিয়, লোকাভিরাম, করুণাময়; সীতা অশেষ গুণালঙ্কৃতা, অসামান্যা সহিষ্ণু, পতিব্রতা, তেজোময়ী, কৌতুকময়ী, করুণাময়ী; লক্ষ্মণ

অসামান্ত সংযমী ও অসাধারণ ভ্রাতৃভক্ত; ভরত অনন্তসাধারণ ত্যাগী, জ্যেষ্ঠানুগত; হনুমান মহাদূরদর্শী, জ্ঞানী ও প্রভুভক্ত; সুগ্রীব, বিভীষণ, গুহক বিচিত্র বন্ধু, আশ্চর্য্য নিঃস্বার্থ সখা। রাবণ অলৌকিক শক্তিধর, বীর ও জ্ঞানী; মৃত্যুর সময়েও পরম শত্রুকে হিতোপদেশ দিতে অকুণ্ঠিত। পিতার আজ্ঞায় রাক্ষসের মুখে যাইতে বা চৌদ্দ বৎসর বনবাসে যাইতেও রাম বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। সীতাদেবীও ছায়ার ন্যায় স্বামীর সঙ্গে বনবাসে তিলমাত্র ক্লিষ্টা বা অগ্নি-পরীক্ষায়ও ভীতা বা সঙ্কুচিতা হন নাই—পতির আজ্ঞায় নির্ব্বাসন দণ্ডে বিচলিতা হন নাই। যেখানে ছিল উচ্ছৃঙ্খলতা, ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, সেইখানেই রামচন্দ্র আবির্ভূত হইয়া সেই সমুদয় উচ্ছৃঙ্খলতা, গ্লানি ও অধর্ম্ম ধ্বংস করিয়া দেশময় ধর্ম্মের শক্তির স্নিগ্ধছায়া বিস্তার করিয়াছেন।

রামায়ণের আদ্যও নানা সন্নীতিতে পরিপূর্ণ। সংসারী নর-নারীর যুবক-যুবতীর, বালক-বালিকার মানুষের মত মানুষ হইবার জন্য যাহা যাহা শিক্ষণীয়, চরিত্র-গঠনের জন্য যাহা প্রয়োজনীয়, সবই নানা ভাবে এবং নানা ঘটনা ও চরিত্রের মধ্য দিয়া ইহাতে সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পিতা ছেলেকে কেমন করিয়া ভাল করিয়া তুলিবেন, দশরথের রাম-লক্ষ্মণাদির শিক্ষাদান-প্রণালীতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রেষ্ঠ বাঙালী রামায়ণকার কবি কৃত্তিবাস তাঁহার সর্ব্বজনাদৃত পদ্য রামায়ণে যে সমুদয় নীতি ঘটনাচ্ছলে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারই কতকগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

কৃত্তিবাস ভগবানের বিধান যে অমোঘ তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন :—

"কালের বিভক্ত কাল পূর্ণ হলে পরে।
ত্রিভুবনে কার সাধ্য কে রক্ষিতে পারে।" —লঙ্কাকাণ্ড

পিতা রাজর্ষি জনকের মুখ দিয়া সীতাকে বলাইতেছেন :—

"শ্বশুর শাশুড়ী প্রতি রাখিহ সুমতি।
রাগ, দ্বেষ, অসূয়া না কর কারো প্রতি॥
সুখ-দুঃখ না ভাবিও—যা আছে কপালে।
স্বামি-সেবা সতী না ছাড়িবে কোন কালে॥"

রাবণের প্রতি বিভীষণ বলিতেছেন :—

"প্রিয়বাদী জন রাজা সর্ব্বত্র সুলভ।
অপ্রিয় কথ্যের বক্তা শ্রোতাও দুর্লভ॥"

রামের প্রতি তারা বলিতেছেন :—

"স্বামী দাতা স্বামী কর্ত্তা স্বামী মাত্র ধন।
স্বামী বিনা গুরু নাই, বলে জ্ঞানী জন॥"

রাম লক্ষ্মণকে বলিতেছেন :—

"হইলে কাতর লোক নিন্দা করে লোকে।
শোকে বুদ্ধি নাশ হয়, ক্ষিপ্ত হয় শোকে॥"

বালীকে রাম কহিতেছেন :—

"পৃথিবীতে যত রাজা আছে যুগে যুগে।
দয়া করে কোন্ রাজা ছাড়িয়াছে মৃগে॥"

তারার মুখ দিয়া কবি বলাইতেছেন :—

"নারীর গৌরব যত স্বামী সব জানে।
কি করিতে পারে পুত্র স্বামীর বিহনে॥

*   *   *

শত পুত্রবতী যদি স্বামীহীনা হয়।
তথাপি সকলে তারে অভাগিনী কয়॥"

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন :—

জ্ঞাতি বন্ধু সহোদর ঘরে যত লোক।
সবার অধিক ভাই স্ত্রীর বড় শোক॥

তারা লক্ষ্মণকে বলিতেছেন :—

"জ্যেষ্ঠের হইলে মিত্র সে হয় গর্ব্বিত।
জ্যেষ্ঠের সমান তারে মানিতে উচিত॥"

জাম্ববান বলিতেছেন :—

ঝড়ে বৃক্ষ ভাঙ্গিলে পল্লব নাহি রয়।
যদি মূল থাকে, পত্র পুনরায় হয়॥

পতিব্রতা সীতা বলিতেছেন :—

"রাম বিনা অন্য জনে নাহি জানে সীতা।
রাম প্রাণনাথ মোর, রাম সে দেবতা॥

বিভীষণ রাবণকে বলিতেছেন :—

"দেখ এক মত্ত হাতী প্রবেশিলে বনে।
সকলের ক্ষতি করে, ক্ষমা নাহি মানে॥

* * *

দুষ্টের মশানে হয় শিষ্টের বন্ধন।
সেই মত তব পাপে মজে পুরজন॥"

তরণীসেন স্বীয় মাতা সরমাকে বলিতেছেন :—

"কে কারে মারিতে পারে, কেবা কার রিপু।
এক বিষ্ণু বিশ্বময়, ভিন্ন ভিন্ন বপু॥"

হনুমানের প্রতি তপস্বি-বেশধারী কালনেমীর উক্তি :—

"যে বাড়ী অতিথি আসি করে উপবাস।
অতিথির উপবাসে হয় সর্ব্বনাশ॥

অতিথি দেখিয়া যেবা না করে আশ্বাস।
সর্ব্বনাশ হয় তার, নরকে নিবাস ॥"

নানা কাণ্ডে বিক্ষিপ্ত কতকগুলি নীতি উপদেশ এইরূপ :—

মান্য লোকে মন্দ কথা নহে উপযুক্ত।
মান্য সহ আলাপ করিবে, ধর্ম্মে ব্যক্ত ॥

* * *

জ্যেষ্ঠ ভাই পিতৃসম, সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
তাঁর পত্নী কেবল মায়ের তুল্য হয় ॥

—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

কাতর হইয়া যেবা লইল শরণ।
পরলোক নষ্ট যদি না করে পালন ॥

—সুন্দরকাণ্ড

অস্থির না হও কহ বিপত্তি সময়।
সুস্থির হইলে সর্ব্ব কার্য্যসিদ্ধি হয় ॥

—লঙ্কাকাণ্ড

যাহার বিক্রমে সবে করেন ভরসা।
তাহার জীবন ধন্য বিক্রম প্রশংসা ॥

—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

রাজার গৃহিণী হয় প্রজার জননী।
মাতাকে দেখিবে পুত্র, ইহাতে কি হানি ॥

—লঙ্কাকাণ্ড

রাজা হয়ে স্ত্রীর যদি না করে বিচার।
স্ত্রীর অনাচারে নষ্ট হইবে সংসার ॥

—উত্তরাকাণ্ড

মাতৃহীন বালক যে সর্ব্বদা অস্থির।
যার মাতা আছে তার সফল শরীর॥

—উত্তরাকাণ্ড

রাবণ রামচন্দ্রকে নীতি-উপদেশ দিতেছেন :—

করিতে উত্তম কর্ম্ম বাঞ্ছা যবে হবে।
আলস্য ত্যজিয়া তাহা তখনি করিবে॥
পার কর রামচন্দ্র, পার কর মোরে।
দীন দেখি নৌকা রাম লয়ে গেলে দূরে॥
যার সনে কড়ি ছিল গেল পার হয়ে।
কড়ি বিনা পার করে, তারে বলি নেয়ে॥

রামায়ণের নীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'বৃহৎ বঙ্গ' গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

হিন্দু সমাজ ভিক্ষুধর্ম্মের ঘা সহিয়া দাঁড়াইল—একখানি গ্রন্থের বলে। সেই গ্রন্থের তুল্য প্রিয় গ্রন্থ হিন্দুর আর একখানিও নাই—উহা রামায়ণ। গ্রন্থখানি এই সত্য প্রচার করিল যে, ধর্ম্ম, মোক্ষ, ইহকাল, পরকাল এই সমস্ত লক্ষ্যের সন্ধানই নিজ পরিবারের গণ্ডীতেই পাইবে। পারিবারিক জীবনই সর্ব্বার্থসিদ্ধির শ্রেষ্ঠতম ক্ষেত্র। এই পারিবারিক জীবন তুমি নিজে গঠন কর নাই, উহা ভগবানের দান, তুমি উহা কিছুতেই এড়াইতে পারিবে না। তোমার পারিবারিক দায়িত্ব অপরিহার্য্য।

তুমি যদি পিতৃমাতৃ-সেবা কর—তাঁহাদের আনুগত্য কর, তবে তোমার মোক্ষলাভ হইবে। সুতরাং সাক্ষাৎ ভগবানের প্রতীক পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া বনে যাইয়া কে কি শিখিবে? তুলসীতরু-সমাশ্রিত মন্দির-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়া সেওড়া-গাছের সেবা করিতে বনে

যাইব কেন? একমাত্র পিতৃসত্য পালন করার জন্ত রাম ভগবানের অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অনুসরণ এবং তাঁহার ছন্দানুবর্ত্তী হইলেও মোক্ষলাভ হইতে পারে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে যদি কনিষ্ঠের অনৈক্য হয়, তথাপি কনিষ্ঠ তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলেই তদীয় জীবন চরিতার্থ হইবে। লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে নানা বিষয়েই মতদ্বৈধ দেখাইয়াছেন—কিন্তু তাঁহার ক্ষুরধার যুক্তি-তর্ক তিনি সরযূর জলে ভাসাইয়া দিয়া ছায়ার ন্যায় রামের ছন্দানুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। ভরত স্বগৃহে থাকিয়াও ভ্রাতৃস্নেহের আদর্শ দেখাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। সীতা স্বামী-ভক্তির মূর্ত্তিমতী প্রতিমা। কৌশল্যা বাৎসল্যের প্রতীক। পরিবার বলিতে শুধু ইঁহারাই নহেন—দাসদাসীরাও পরিবারের জন। হনুমান প্রভুভক্তিকে অতি উজ্জল করিয়া দেখাইয়াছেন এবং সুগ্রীব ও বিভীষণ সখ্যভাবের আদর্শ কিরূপ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

রামায়ণ বলিতেছেন—পরিবারের গণ্ডীই ধর্ম্মের সুপ্রশস্ত আঙিনা। এই পারিবারিক ধর্ম্মের পথ কুসুমাকীর্ণ নহে। ভিক্ষু ধর্ম্মের কঠোর পথ পরিহার করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন উপভোগ করিবার জন্ত পারিবারিক ধর্ম্ম পরিকল্পিত হয় নাই। মুণ্ডিতশির হইয়া উপবাস ও ব্রতাদি পালনপূর্ব্বক ছায়ার পশ্চাতে ধাবিত হওয়া অপেক্ষা গৃহের জীবন্ত দেবতাদের সেবা উৎকৃষ্ট—ইহাই রামায়ণের প্রতিপাদ্য। এই পারিবারিক ক্ষেত্র দুশ্চর তপস্যারই ক্ষেত্র, ইহা অবিচ্ছিন্ন শান্তি ও অবিঘ্নিত সুখভোগের পন্থা নহে। কোন্ জটিল সন্ন্যাসী পিতৃভক্তিতে ভরপুর রামসন্ন্যাসীর মত দুশ্চর ব্রত পালন করিয়াছে? জটাজুটধারী, মলিন, পাণ্ডু-দিগ্ধাঙ্গ, পাদুকার উপর ছত্রধারী, রাজর্ষি ভরত ভ্রাতৃভক্তির যে আদর্শ দেখাইয়াছেন—সেই অতুল ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যার সমতুল তপস্যা কোন্ ভিক্ষু কবে দেখাইয়াছে? কে লক্ষ্মণের মত ভ্রাতৃসেবায় আহার-নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে বা সীতার ন্যায় আজীবন পাতিব্রত্যের ব্রত পালন করিয়া অগ্নিপরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছে? কে কবে বিভীষণের মত সাশ্রুনেত্রে স্বকুলের সংহার প্রত্যক্ষ করিয়াও সখ্যচ্যুত হয় নাই? এই সকল চরিত্রের প্রত্যেকটি একটি বিশাল

পটের ন্যায়। ইহারা বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুর জীবন্ত প্রতিবাদ। সেই প্রতিবাদ তীক্ষ্ণ বৈরাগ্যের লৌহ-শলাকাদ্বারা লিখিত হয় নাই—দুশ্চর তপস্যা-ক্ষেত্রে অনুরাগের স্বর্ণ-অক্ষরেই লিখিত হইয়াছে। এই পথ বিচার, তর্ক, নীতি-জ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ প্রভৃতি উৎকট উপায়জাত নহে—ইহা গঙ্গাতরঙ্গের মত পরম স্নেহ-মমতার সুবিমল বিস্ময়কর উৎস। ইহা স্বভাব সঞ্জাত প্রীতি, ভক্তি ও অনুরাগের ঝরণার বিন্দু চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিয়া লীলা-চঞ্চল গতিতে ছুটিয়াছেন। ঐ বন-মরুভূমিতে ইহা অমৃতের সন্ধান দিয়াছে এবং দেখাইয়াছে। যেরূপ লেংড়া আমের বীজটী যেখানে পুঁতিবে, সেইখান হইতেই ইহা তাহার অপূর্ব্ব সুরভি ও অতুল রসাস্বাদের ভাণ্ডার খুলিয়া বসিবে—সেইরূপ ভগবান যেখানে তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন—তোমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধির পথও সেইখানে গড়িয়া দিয়াছেন—তুমি বাহিরের আঁকাবাঁকা অনিশ্চিত পথ খুঁজিতে বনে যাইবে কেন?

বৌদ্ধ ধর্ম্মের পর এই রামায়ণী-নীতি ভারতের সর্ব্বত্র বিজয়-পতাকা প্রোথিত করিয়া ভারতীয় সমাজকে এক অপূর্ব্ব শান্তির আদর্শ দিয়াছিল। এখনও যে এক পরিবারে বহু সংখ্যক লোক আদরে, সোহাগে, শ্রদ্ধায় ও ত্যাগের মহিমায় গৌরবজনক স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা এই একখানি মহাগ্রন্থের শিক্ষার প্রভাবে। কিন্তু বাঙলা দেশে ইহার শক্তি হ্রাস হইতেছে, রামায়ণী শিক্ষা বুঝি এদেশ হইতে তিরোহিত হয়! কিন্তু এক সময়ে ইহা অত্যুজ্জ্বল ছিল, তাহা আমরা শৈশবে দেখিয়াছি। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আজমীঢ়ের রাজপুত্র সারঙ্গদেবকে—বৌদ্ধধর্ম্মের অনুরাগী আশঙ্কা করিয়া তৎপিতা রাজা বিশালদেব নানা উপদেশ দিয়া কুমারকে শেষে বলিয়াছিলেন :—

"ইহ নষ্টজ্ঞান জ্ঞান সুনিয়েণ কান। পুরুষোত্তম ভজ্জে কিত্তীহান॥
পরমোৎব ভুজ্ঞ বোধক পুরাণ। রামায়ণ সুনহ ভারত নিদান॥"—

চাঁদ-গাথা।

সম্পূর্ণ